পিতা ও পুত্র

ভেরা পানোভা

অনুবাদ

শিউলি মজুমদার

পপুলার লাইব্রেরী
১৯৫/১বি, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

পিতা ও পুত্র

শেরিওঝা কোথায় থাকে

সবাই বলে ও নাকি দেখতে ঠিক মেয়েদের মত! সত্যি, কী বোকা ওরা! মেয়েরা তো ফ্রক পরে, কিন্তু ও তো ফ্রক পরেনি কতোকাল। তাছাড়া, মেয়েদের কি গুলতি থাকে? কিন্তু শেরিওঝার তো একটা গুলতি আছে, আর ও সেটা দিয়ে একের পর এক কত পাথর ছোঁড়ে। শুরিক ওকে ওটা বানিয়ে দিয়েছে। তার বদলে অবশ্য জীবনভর যে সূতোর কাটিমগুলো জমিয়েছিল শুরিককে সেগুলো সব দিয়ে দিতে হয়েছে।

তবে হাঁ, ওর চুলগুলো ঠিক মেয়েদের চুলের মতই বড় বড়। কতবার তো ওর চুল কল দিয়ে ছেঁটে দেওয়া হোল, কত কষ্টই না সে সহ্য করেছে। কিন্তু হলে কি হবে, কয়েক দিনের মধ্যেই ওর চুল আবার আগের মতই যেমন ছিলো তেমনটি হয়ে যায়।

একটা বিষয়ে কিন্তু সবাই একমত; ওর বয়সের তুলনায় ও নাকি অনেক বেশি চালাক। একবার কি দু'বার একটা বই ওকে পড়ে শোনালেই ওর সেটা পুরো মুখস্থ হয়ে যায়। অক্ষরগুলো ও ঠিকই চিনতে পারে, কিন্তু নিজে নিজে পড়তে বড্ড সময় লাগে যে! বইয়ের ভেতরে ছবিগুলোকে ও রঙীন পেন্সিল দিয়ে রাঙিয়ে দেয়। রঙীন ছবিগুলোকে আবার খেয়াল খুশি মত অন্য রঙে সাজায়। এমনি করে ছবি রঙ করতে শেরিওঝার বড্ড ভাল লাগে। কয়েক দিনের মধ্যেই কিন্তু বইগুলো আর নূতন, ঝকঝকে থাকে না।

পাতাগুলো একটা একটা করে ঝরতে থাকে। পাশা মাসী সেগুলোকে আবার সেলাই করে দেয়। বইয়ের পাতা হারিয়ে গেলে শেরিওঝার আর সেটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এতটুকুও শান্তি নেই। বই ও সত্যি ভালবাসে। তবে বইয়ের সব কথাগুলো ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে না। পশু পাখী কি কথা বলতে পারে নাকি? কার্পেট কখনও উড়তে পারে না, ইঞ্জিন নেই যে। এসব আজগুবী কথা বিশ্বাস করবে এমন বোকা আর কে আছে? তাছাড়া, বড়রা ভূত পেত্নী ডাইনীর গল্প পড়ে যখন বলে, 'সত্যিই কিছু আর ভূত পেত্নী ডাইনী নেই,' তখন বইয়ের এই আজব গল্পগুলোকেই বা কেমন করে বিশ্বাস করা যায়?

তা হলেও সেই যে গল্পটা, যারা ছেলেমেয়েগুলোকে বনে নিয়ে গিয়ে হারিয়ে ফেলতে চেয়েছিল, বুড়ো আংলা ওদের বাঁচিয়েছিল অবশ্য; ওসব গল্প শুনতে শেরিওঝা মোটেই ভালবাসে না, ও বই তাকে পড়ে শোনাতে এলে শেরিওঝা বারণ করে।

শেরিওঝা ওর মা, পাশামাসী আর মেসো লুকিয়ানিচের সঙ্গে থাকে। ওদের ছোট্ট বাড়ির তিনখানি ঘরের একখানিতে ও আর ওর মা ঘুমোয়। মাসি আর মেসো আর একটি ঘরে থাকে। তৃতীয় ঘরটি ওদের খাবার ঘর। কেউ অতিথি এলে ওরা খাবার ঘরে খায়, না হয় রান্না ঘরেই খায়। বাড়ির সামনে একটানা লম্বা বারান্দা আর একফালি উঠানও আছে। উঠানে আছে একপাল মুরগী আর একপাশে পেঁয়াজ আর

মূলোর বাগান। দুষ্টু মুরগীগুলো যাতে সব খেয়ে ফেলতে না পারে সেজন্য কাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে বাগানটা ঘেরাও করে দেওয়া হয়েছে। আর শেরিওঝা মূলো তুলতে গেলেই সেই কাঁটার আঁচড়ে ওর পা দুটো ছড়ে যাবেই যাবে।

লোকে বলে ওদের শহরটা নাকি বেশ ছোট্ট। একথাটা কিন্তু একেবারেই বাজে। ও আর ওর বন্ধুরা সবাই জানে ওদের শহরটা বেশ বড়। কত দোকানপাট, বাড়িঘর, মনুমেণ্ট, সিনেমা হল। কি নেই ওদের শহরে? মা ওকে মাঝে মাঝে ছবি দেখাতে নিয়ে যায়। আলো নিভে ছবি আরম্ভ হলে ও চুপি চুপি মাকে বলে, 'মা, তুমি বুঝতে পারলে আমাকেও একটু বুঝিয়ে দিও, কেমন?'

ওদের বাড়ির সামনে বড় রাস্তার ওপর দিয়ে কত লরী আসছে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে টিমোখিনের বিরাট লরীতে চড়ে ওরা বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল এদিক ওদিকে বেড়িয়ে আসে। কিন্তু ভড্‌কা খেলেই টিমোখিন আর কাউকে লরীতে চড়তে দেবে না। তখন ছেলেরা ওকে ডাকলেও ও হাত নেড়ে বলবে, 'এখন তোমাদের নেব না। দেখছো না আমি মাতাল হয়েছি!'

শেরিওঝাদের রাস্তার নামটা কী অদ্ভুত! ফার স্ট্রীট, অর্থাৎ কিনা দূরের রাস্তা। কিন্তু এটা তো শুধুই একটা নাম, কেননা সব কিছুই তো এই রাস্তার কাছাকাছিই রয়েছে। খেলার মাঠ, বাজার, সিনেমা হল আর ব্রাইট শোর সরকারী খামার তো কত কাছে! আর এই ফার্মের মত নামকরা

জায়গাই বা এখানে আর ক'টা আছে ? ওখানেই তো লুকিয়ানিচ কাজ করে। মাসি ওখান থেকেই হেরিং মাছের আচার কিনে আনে। মার স্কুল তো ঐ খামারের ভেতরেই। ছুটির দিনে মা ওকে স্কুলের আনন্দমেলায় নিয়ে যায়। সেখানেই ও লাল চুলওয়ালা মেয়ে ফিমাকে দেখেছে। ফিমার বয়স আট বছর, কিন্তু কত বড় দেখতে! কাণের ত্বপাশ দিয়ে বিনুনী করা চুলের ডগায় লাল, নীল, শাদা, হলদে, বেগুনি কত রকমারি রিবনের বাহার। রিবনের যেন আর শেষ নেই। শেরিওঝা ওসব কিছু লক্ষ্য করতো না। কিন্তু ফিমাই একদিন ওকে ডেকে বলেছে, 'এই, দেখতে পাও না নাকি ? দেখেছ, আমার কত ফিতে ?'

ছোটখাট ত্বঃখ কষ্ট

ফিমা খুব সত্যি কথাই বলেছে। শেরিওঝা অনেক কিছুই লক্ষ্য করে না। চারদিকে এত কিছু রয়েছে দেখবার, সব কি দেখা যায় নাকি ? না, দেখা সম্ভব ? তোমার চারপাশ ঘিরে তো অফুরন্ত দেখবার জিনিস। পৃথিবীটা যেন হাজার জিনিসে বোঝাই হয়ে আছে। তাই, সমস্ত কিছু লক্ষ্য করা যে একেবারেই অসম্ভব! তাছাড়া, সব জিনিসগুলোই কেমন বড় বড়। দরজাগুলো কী ভয়ানক উঁচু আর মানুষগুলো তো (অবশ্য বাচ্চারা ছাড়া) ইয়া লম্বা চওড়া, এক একটা দৈত্য যেন! গাড়ি, ঘোড়া, লরী, রেল গাড়ির ইঞ্জিন, এসবের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। ইঞ্জিনের বাঁশী তো

কানে তালা লাগিয়ে দেবে, তখন তুমি আর অন্য কিছু শুনতে পাবে না।

তবুও ওরা সবাই কিছু ভয়ানক নয় কিন্তু! সকলেই শেরিওঝাকে কত ভালবাসে, ও যদি চায় তাহলে মাথা নীচু করে ওর কথা মন দিয়ে শোনে, হাসে। কই, ওদের বিরাট পাগুলো দিয়ে ওকে একবারও তো মাড়িয়ে দেয় না। লরী আর অন্য গাড়িগুলোও তো ওকে কখনও আঘাত করে না। অবশ্য ওদের একেবারে মুখোমুখি হয়ে পড়লে সে আলাদা কথা। রেলের ইঞ্জিনগুলো অনেক দূরে, ঐ ষ্টেশনে থাকে। শেরিওঝা তু' একবার টিমোখিনের সঙ্গে ওখানে গিয়েছে। ষ্টেশনের দক্ষিণ কোণে খালি জায়গাটায় কী ভীষণ একটা জন্তুকে ও পড়ে থাকতে দেখেছে। ওর ভীষণ তু'টো চোখ রাগে আর সন্দেহে কটমট করে তাকিয়ে আছে! একটা বিরাট নাক ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিঃশ্বাস ফেলছে। গাড়ির চাকার মত বুকটা আর লোহার মত শক্ত ঠোঁটও আছে ওর। তু'টো কঠিন থাবা দিয়ে ও মাটির বুকে আঁচড়ায় সব সময়। যখন ও গলাটা বাড়িয়ে চলতে আরম্ভ করে তখন শেরিওঝার মতই লম্বা দেখতে হয়। একদিন একটা কুকুর ছানা ওদিক থেকে দৌড়ে এসে ওর সামনে পড়তেই ঐ বিশ্রী জন্তুটা তাকে গপ্ করে গিলে ফেললো। শেরিওঝাকেও বুঝি এমনি করে একদিন ও গিলে ফেলবে! শেরিওঝা ষ্টেশনে এলেই জন্তুটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে ওটাকে আড় চোখে দেখ্তে থাকে। জন্তুটাও যেন ওর লাল চিরুণীটা বার করে সারাক্ষণই কিছু

একটা খাচ্ছে। ওকে ওর হিংস্রুটে তুটো চোখ দিয়ে একদৃষ্টিতে কেবল দেখছে আর দেখছেই। এই জন্তুটাকে দেখলেই ওর ছোট্ট বুকটা ভয়ে তুর্ভাবনায় কেমন ছমছম্ করে ওঠে।

মোরগ ঠোক্‌রায়, বিড়াল আঁচড়ায়, বিছুটি হুল ফোটায়, দামাল ছেলের দল মারামারি করে আর ধপাস্ করে আছাড় খেলে মাটি হাঁটু ঘসে দিয়ে তোমার পায়ের চামড়া ছিঁড়ে দেয়। তাই শেরিওঝার গায়ে হাতে পায়ে সব সময় কাঁটা ছেঁড়া আঁচড়ের একটা না একটা দাগ দেখা যাবেই। ওর ছোট্ট শরীরের যে কোন একটা জায়গা ফুলে থাকবেই। আর প্রায় প্রতিদিনই শরীরের কোন না কোন অংশ থেকে রক্ত ঝরবে। কারণ একটা না একটা ব্যাপার রোজই তো ঘটছে কিনা! ভাস্কা হয়তো কোন উঁচু বেড়া বেয়ে বেয়ে উঠলো, তাই দেখে শেরিওঝাও উঠতে গেল। কিন্তু খানিকটা উঠতে না পেরে বেচারা ধপাস্ করে আছাড় খেয়ে পড়লো। লিডাদের বাগানে সবাই মিলে হয়তো একটা নালা কেটে একে একে সেটার ওপর দিয়ে লাফাতে লাগলো। কিন্তু শেরিওঝা লাফাতে গিয়েই পড়বি তো পড় একেবারে সেই নালার ভেতরে। পা তু'টো ওর তক্ষুণি ফুলে ব্যথা হয়ে গেল আর তার পরই বেশ কয়েক দিনের জন্য বিছানায় বন্দী। আবার ভাল হয়ে প্রথম যেদিন বল খেলতে বের হল, বল তো ছাদের ওপর লাফিয়ে উঠে চিমনীতে আটকে গেল। ভাস্কা বলটা নিয়ে না আসা পর্যন্ত শেরিওঝাকে বোকার মত ওপর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে হল। আর

একবার তো ও প্রায় ডুবেই গিয়েছিল আর কি! লুকিয়ানিচ ওদের একদিন নদীতে নৌকো করে বেড়াতে নিয়ে গেল। শেরিওঝা, ভাস্কা, ফিমা, নাদিয়া ওরা একয়জন ছিল। কিন্তু লুকিয়ানিচের নৌকোটা এত বিশ্রী ছিল যে ছেলেরা এদিক ওদিক একটু নড়াচড়া করতেই নৌকোটা ভীষণ হেলেদুলে একেবারে কাত হয়ে গেল, ওরা একে একে ঝুপ ঝুপ করে জলের মধ্যে পড়লো। কেবল লুকিয়ানিচ নৌকো থেকে জলে পড়ে যায়নি। উঃ! জলটা কী ঠাণ্ডা, একেবারে যেন বরফ! শেরিওঝার নাকে, কানে, মুখে এমন কি পেটের মধ্যেও সেই ঠাণ্ডা জল হুড়মুড় করে ঢুকে যেতে লাগলো, সে চেঁচাতেও পারলো না। নিজেকে হঠাৎ খুব ভারী মনে হতে লাগলো। মনে হোল কেউ যেন ওকে টেনে হিঁচড়ে কোথায় নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এত ভয় ও জীবনে আর কোনদিন পায়নি। চারদিক আঁধার হয়ে এলো। এভাবে কতক্ষণ ও নামছিল কে জানে! আচমকা কে যেন ওকে উপরের দিকে টেনে তুলল।

অনেক কষ্টে চোখ খুলে দেখলো নদীটা এবার ওর মুখের নিচে, আর একটু দূরেই পার দেখা যাচ্ছে এবার আর অন্ধকার নয়, সোনার রোদে চারদিক ঝিকমিক করছে। ওর ভেতরকার জল গড় গড় করে এবার বেরিয়ে এলো, সে নিঃশ্বাস নিতে পারলো। পার ক্রমেই ওর কত কাছটিতে এগিয়ে এলো যেন। তারপর পারের নাগাল পেয়ে সে শীতে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে শক্ত জমিতে বসলো। ভাস্কা ওকে জলের ভেতর থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলেছে।

কিন্তু ওর এত লম্বা চুল না থাকলে কি হোত ? ফিমা সাঁতার জানে, তাই সাঁতরে পারে উঠতে পেরেছে আর লুকিয়ানিচ নাদিয়াকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু লুকিয়ানিচ নাদিয়াকে টেনে টেনে তোলবার সময় নৌকোটা খেয়াল খুশি মত কোথায় ভেসে চলে গেল। ঢালুর দিকে যৌথ খামারের কয়েকজন লোক নৌকোটা পেয়ে লুকিয়ানিচের অফিসে টেলিফোন করে খবর দিয়েছিল। তারপর থেকে আর কোন দিন লুকিয়ানিচ ওদের নৌকো করে বেড়াতে নিয়ে যায় নি। বললেই বলে, "ওরে বাপ্‌রে, আবারও তোমাদের নিয়ে যাব ? আমার যথেষ্ট আক্কেল হয়েছে।"

সারাটা দিন এমনি কত কাণ্ড কারখানা করে, এত জিনিষ দেখেশুনে শেরিওঝা দিনের শেষে ঝিমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যে হলেই আর কথা নেই, চোখ ছু'টো ওর বুজে আসে, কথা কেমন জড়িয়ে যায়। হাত পা ধুইয়ে, খাইয়ে তারপর রাত্রির লম্বা জামাটা গায়ে গলিয়ে দিয়ে ওরা ওকে শুইয়ে দেয়। সে বুঝতেই পারে না তার দম ফুরিয়ে গিয়েছে। নরম বালিশে আরামে মাথাটি রেখে ছোট্ট ছু'টি হাত ছু' পাশে ছড়িয়ে এক পা গুটিয়ে অন্য পাটা ছড়িয়ে ও ঘুমিয়ে পড়ে। নরম ফুরফুরে লম্বা চুলগুলো ওর স্থন্দর মুখখানির ছু' পাশে আলতো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তরুণ ষাঁড়ের মত ওরও ছু' ভুরুর পাশে উঁচু হয়ে থাকে। ডাগর চোখের ফুলের পাপড়ির মত পাতা ছু'টি বোজা রয়েছে। ঠোঁট ছু'টির মাঝখানটি একটু ফাঁক হয়ে আছে, কোণায় ঘুমের আমেজ জড়ান। নিঃশ্বাস

পড়ছে কি পড়ছে না তাও বোঝা যায় না। নিঃসাড় হয়ে ছোট্ট ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে ঠিক যেন একটি ফুলের মত। এখন তুমি ওর কানের কাছে একটা ঢাক নিয়ে জোরে বাজাও, বন্দুক ছোঁড়ো, কিন্তু ও আর জাগবে না। ও কিছুই জানতে পারবে না। আসছে কাল ভোর হতেই আবার ওকে করতে হবে বাঁচার জন্য সংগ্রাম, তাইতো এখন ও প্রাণভরে ঘুমিয়ে নিচ্ছে ... ...

বাড়ীতে এলো পরিবর্তন

একদিন মা ওকে বললো, 'শেরিওঝা শোন······ভাবছি, তোমার বাবা থাকলে বেশ হয়।'

ও অবাক হয়ে মাথা তুলে মার দিকে তাকালো। এ কথা তো ও কোনদিন ভাবে নি! ওর বন্ধুদের অনেকেরই বাবা আছে বটে, আবার অনেকের নেইও। ওরও বাবা নেই। ওর বাবা নাকি যুদ্ধে মারা গেছে। বাবাকে ও কোনদিন দেখেও নি। শুধু ছবি দেখেছে। মা মাঝে মাঝে সেই ছবিতে চুমু দিয়ে আবার ওকেও চুমু দেবার জন্য দেয়। মায়ের গরম নিঃশ্বাসে ছবির আবছা কাচের ওপর ও অনেক বারই চুমু দিয়েছে কিন্তু ছবির বাবাকে ও একটুও ভালবাসতে পারে নি। শুধু শুধু ছবিতে দেখে কি কাউকে ভালবাসা যায় নাকি?

আর আজ মা একি বলছে? মায়ের দু'হাঁটুর মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে শেরিওঝা অবাক দৃষ্টিতে মার দিকে তাকিয়ে

আছে। মায়ের মুখখানি কেমন লালচে হয়ে উঠছে যেন; প্রথমে গাল দুটো, তারপর কপাল কান সব লাল হয়ে উঠলো। মা ওকে হাঁটুর কাছে জড়িয়ে ধরে ওর মাথায় চুমু খেলো। এখন আর ও মায়ের মুখ দেখতে পাচ্ছে না শুধু

মায়ের জামার নীল হাতায় সাদা দাগগুলো ওর চোখে পড়ছে। মা চুপি চুপি বলছে, 'বাবা থাকলে বেশ হয়, তাই না শেরিওঝা?'

শেরিওঝাও চুপি চুপি বললো, 'হুঁ......' কিন্তু সত্যি কি:

আর ও তাই ভাবছে ? মাকে খুশী করবার জন্য ও মায়ের কথায় সায় দিল। তক্ষুণি ও ভাবতে বসলো, আচ্ছা বাবা থাকা ভাল, না, না থাকাই ভাল ? কোন্‌টা ? টিমোখিন যখন ওদের সবাইকে তার লরীতে বেড়াতে নিয়ে যায় তখন শুধু শুরিক টিমোখিনের পাশে লরীর সামনে বসতে পায়। ওরা সব্বাই ওকে এজন্য হিংসে করলেও কিছু বলতে পারে না কারণ টিমোখিন যে শুরিকের বাবা। আবার শুরিক দুষ্টুমী করলে টিমোখিন ওকে চাব্‌কায়। তখন শুরিক কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেললে ওকে খুশি করবার জন্য শেরিওঝাকেই ওর সব খেলনাগুলো দিয়ে দিতে হয়। কিন্তু তা হোক····· তবু যেন বাবা থাকাই ভাল। কয়েকদিন আগে ভাস্কা লিডাকে ক্ষেপালে লিডা বলেছিল, 'আমার বাবা আছে। তোমার তো বাবা নেই। দুয়ো······'

শেরিওঝা হঠাৎ মায়ের বুক থেকে মুখখানি তুলে মায়ের বুকে হাত রেখে প্রশ্ন করলো, 'ওখানে ওটা কি ধুক্ ধুক্ করছে মা ?'

মা একটু হেসে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়ে বললো, 'ওটা আমার বুক।'

শেরিওঝা মাথা নীচু করে মায়ের বুকের ওপর কান পেতে রেখে বললো, 'আমারও বুক আছে ?'

'হাঁ, তোমারও আছে।'

'কই, আমি তো আমার বুকের ধুক্‌ধুক্কানি শুনতে পাচ্ছি না।'

'তুমি না শুনতে পেলেও ওটা ঠিকই ধুক্‌ধুক্‌ করে যাচ্ছে। না হলে কেউ বাঁচতে পারে না।'

'ওটা সব সময় ওরকম করে ?'

'হাঁ।'

'তুমি আমার বুকের ধুক্‌ ধুক্‌ শব্দ শুনতে পাও ?'

'হাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। আর তুমিও হাত দিলে বুঝতে পারবে। এই যে, হাত দাও এখানে,' মা ওর হাতখানি টেনে নিয়ে ওর বুকের পাঁজরে রেখে বললো, 'বুঝতে পারছো ?'

'হাঁ……ওঃ! বেশ জোরে জোরে শব্দ করছে তো। ওটা কি অনেক বড় ?'

'হাতটা মুঠো কর। হাঁ, এবার এই মুঠো হাতটির মত বড় ওটা, বুঝলে ?' আচমকা কি ভেবে মায়ের কোল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শেরিওঝা ছুটে চললো। মা প্রশ্ন করলো, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

'আসছি এক্ষুণি।'

ও এবার এক দৌড়ে রাস্তার ওপর চলে এসে ভাস্কা আর ঝেঙ্কাকে দেখতে পেয়ে ওদের কাছে গিয়ে বুকের বাঁ পাশে হাত রেখে বললো, 'দেখ, দেখ, এই যে এখানে আমার বুক রয়েছে। আমি হাত দিয়ে ওটাকে অনুভব করতে পারছি। তোমরাও হাত দিয়ে দেখ না……'

'ফুঃ! তোমার বুক! ও তো সবারই আছে।' ভাস্কা গম্ভীর মুখে বিজ্ঞের মত বললো। ঝেঙ্কা এগিয়ে এসে ওর বুকে হাত রেখে বললো, 'তাই নাকি ?'

শেরিওঝা এবার বললো, 'বুঝতে পারছো ?'

'হুঁ ।'

'আমার হাতের মুঠোর মত বড় ওটা ।'

'কে বললো ?'

'মা বলেছে ।' হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় ও বলে ফেললো, 'জান, আমার বাবা আসছে ।' কিন্তু ভাস্কা আর ঝেস্কা ওর কথায় একটুও কান দিলে না । ওরা ঔষধের জন্য কি সব লতাপাতা নিয়ে চলেছে, একটা দোকানে ওসব দিয়ে হাত খরচের টাকা রোজগার করবে ওরা । দু'দিন ধরে তাই ওরা রাস্তার ধারে ধারে ঐসব গাছগাছড়া লতাপাতা আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বেরিয়েছে । ভাস্কার মা ওর লতাপাতাগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে পাতলা ভিজে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে দিয়েছে । কিন্তু ঝেস্কার তো আর মা নেই । ওর মাসী আর বোনও যার যার কাজে ব্যস্ত । তাই সে তার গাছগাছড়াগুলোকে নোংরা ভাবেই একটা পুট্‌লি করে বেঁধে নিয়ে চলেছে । কিন্তু ভাস্কার চাইতে ওর গাছগাছড়ার সংগ্রহ অনেক বেশি, তাই তার পুঁট্‌লিটাকে পিঠে চাপিয়ে ভারে নুয়ে পড়ে ও চলেছে । শেরিওঝা ওদের পেছনে দৌড়ে গিয়ে কাতর স্বরে বললো, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব ।'

'না বাড়ি যাও । আমরা কাজে যাচ্ছি', ভাস্কা গম্ভীর গলায় আদেশের ভঙ্গিতে বললো । শেরিওঝা আবার বললো, 'শুধু তোমাদের সঙ্গে যাব ।'

'না, না, বাড়ি যাও বলছি । এটা তো আর খেলা নয় ।

তোমার মত বাচ্চা ছেলেরা ওখানে যায় না, বুঝলে ?' ভাস্কা আবার ধমকে উঠলো। শেরিওঝা এবার থেমে গেল। ওর ঠোঁট দু'টি অভিমানে কাঁপছে। কিন্তু না, ও কাঁদবে না…… লিডা আছে কাছেই, সে এসে ক্ষেপাবে ছিচঁকাঁদুনে বলে। তবুও সে এসে জিজ্ঞেস করল—'ওরা তোমাকে নেবে না বুঝি ?'

শেরিওঝা চোখ মুছে বললো এবার, 'আমি ওদের চাইতে অনেক বেশী লতাপাতা জোগাড় করতে পারি। ঐ আকাশের চেয়েও উঁচু করে লতাপাতা জমাবো দেখো।' লিডা হেসে লুটোপুটি খেয়ে বললো, 'আকাশের চাইতেও উঁচু ? ছেলের কথা শোন! আকাশের চেয়েও উঁচু কিছু হয় নাকি বোকা ছেলে ?'

'আমার বাবা আসবে, দেখো, আমি না পারলেও আমার বাবা ঠিক পারবে।'

'ও তো বানানো গল্প। তোমার বাবা আসবে না আরও কিছু ? আর এলেই বা কি, বাবারাও তা পারে না, কেউ পারে না।'

শেরিওঝা এবার মাথা হেলিয়ে আকাশের দিকে তাকালো, সত্যি কি কেউ ঐ আকাশের চেয়েও উঁচু করে গাছগাছড়া লতাপাতা জমাতে পারে না ? শেরিওঝা একথাটা ভেবেই চলেছে। লিডা কোন্ ফাঁকে এক দৌড়ে বাড়ি গিয়ে একটা রঙিন স্কার্ফ—যেটা ওর মা মাঝে মাঝে মাথায়, গলায় পরে থাকেন—নিয়ে এসে দু' হাত দুলিয়ে কি একটা গান গেয়ে

পা ঠুকে ঠুকে নাচতে সুরু করলো। শেরিওঝা অবাক হয়ে ওকে দেখছে এবার।

লিডা বলল 'নাদকা কি গল্প করতে পারে! ও নাকি ব্যালেতে নাচ শিখবে।' পরে বললে—'মস্কো আর লেলিনগ্রাদের ব্যালেতে নাচ শেখায়।' বলতে বলতে শেরিওঝার চোখে বিস্ময় আর প্রশংসার ছায়া দেখে লিডা আবার নাচ থামিয়ে হেসে প্রশ্ন করলো, 'কি দেখছো? তুমিও নাচবে নাকি? আমাকে দেখে দেখে নাচ না।' শেরিওঝা ওকে নকল করতে লাগলো, কিন্তু ঐ স্কার্ফ ছাড়া কি করে নাচ হয়? লিডা ওকে গান গাইতে বলছে। কিন্তু গান গেয়েও ঠিক অমনটি হচ্ছে না যে!

'স্কার্ফটা একটু দাও না আমায়,' কাতর স্বরে ও বললো। কিন্তু লিডা ওর কথা শুনেও শুনলো না। ঠিক সেই মুহূর্তে শেরিওঝাদের বাড়ির দরজায় একটা গাড়ি এসে থামলো। একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেলে পাশামাসীও ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

'এই যে, ডিমিত্রি কোরনিয়েভিচ্ এসব পাঠিয়েছে,' মেয়েটি বললো। একটা স্যুটকেশ, একটা বইয়ের বাণ্ডিল আর একটা কি ভারী ছাই রঙের জিনিস প্যাকেটে জড়ানো রয়েছে। একটু পরেই বোঝা গেল ওটা একটা সৈনিকের আলখাল্লা। ওরা দু'জনে জিনিসগুলো ভেতরে নিয়ে চললো। মা জানলা দিয়ে একটিবার উঁকি মেরে কোথায় সরে গেল। মেয়েটি মুচকি হেসে মাসীকে বলছে, 'দেখেছ, যৌতুক বিশেষ কিছুই নেই।'

মাসী কেমন দুঃখিত স্বরে বলছে, 'নূতন একটা কোট কিনলেও পারতো অন্ততঃ।'

'কিনবে গো কিনবে। সময় মত সবই কিনবে, দেখো। এই যে, চিঠিটা ওকে দিও।' একটা চিঠি মাসির হাতে দিয়ে মেয়েটি এবার গাড়িতে উঠে গাড়িটা চালিয়ে চলে গেল। শেরিওঝা এবার এক ছুটে বাড়ির মধ্যে এসে চেঁচাতে স্থুরু করলো, 'মা, মাগো, কোরোসটিলেভ তার সৈনিকের কোটটা পাঠিয়েছে দেখ।'

(ডিমিত্রি কোরনিয়েভিচ কোরোসটিলেভ ওদের বাড়িতে প্রায়ই আসতো আগে। শেরিওঝার জন্য সে কত খেলনা, খাবার আনতো। তার সৈন্যদলের কোটটা কী ভীষণ বড় তার আবার কাঁধে বেল্ট নেই, শেরিওঝা তার বিদ্‌ঘুটে এই নামটা কোন মতেই যেন ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারে না। তাই তাকে শুধু কোরোসটিলেভ বলেই ডাকে।)

বিরাট কোটটা এতক্ষণে আলনায় ঝুলছে। মা চিঠিটা পড়ছে একমনে। ওর কথার কোন উত্তর দিল না। চিঠিটা পড়া শেষ করে বললো, 'হাঁ, আমি তা জানি। এখন থেকে উনি আমাদের এখানেই থাকবেন শেরিওঝা। উনিই তোমার বাবা হবেন যে।'

মা আবার চিঠিটা পড়তে স্থুরু করলো।

'বাবা'—কথাটায় যার ছবি শেরিওঝার চোখে ভেসে উঠে সে কেমন যেন অজানা, অচেনা। কিন্তু কোরোসটিলেভ তো ওদের অনেকদিনকার পুরাণো বন্ধু। মাসী আর

লুকিয়ানিচ তো তাকে 'মিতিয়া' বলে ডাকে। মা এসব কি বলছে আবোল তাবোল? হঠাৎ ও প্রশ্ন করে বসলো, 'কেন?'

'আঃ! আমাকে চিঠিটা শেষ করতে দেবে না নাকি দুষ্টু ছেলে?' মা বিরক্ত হয়ে বললো। চিঠিটা শেষ করার পরেও মা ওর প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। ব্যস্তসমস্ত হয়ে কেবল একাজ সেকাজ করতে লাগলো। বইয়ের বাণ্ডিল খুলে বইগুলো ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ঝক্‌ঝকে করে তাকে গুছিয়ে রাখল। পরিষ্কার ঘর-দোরকে আরও একবার পরিষ্কার করে, তকতকে মেঝেকে আবার ধুয়ে মুছে মা নূতন করে ঘর সাজাতে লাগলো। পর্দা, টেবিল ক্লথ সব পালটে ফেলে বাগান থেকে এক গুচ্ছ ফুল তুলে এনে টেবিলের ওপর ফুলদানিতে রাখলো। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে পিঠে তৈরী করতে লাগলো।

মাসী ময়দার গোলা তৈরী করে দিয়ে মাকে সাহায্য করছে, শেরিওঝাও কিছুটা ময়দা-গোলা আর জ্যাম নিয়ে পিঠে বানাতে বসে গেল। তারপর কোরোসটিলেভ এলে সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে ও আনন্দে চীৎকার করে বলে উঠলো, 'জান, তোমার জন্য আমি পিঠে তৈরী করেছি।' কোরোসটিলেভ নত হয়ে দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল। শেরিওঝা ভাবছে আমার বাবা হয়েছে বলেই বুঝি ও আজ এতক্ষণ ধরে আমাকে চুমু খাচ্ছে!

কোরোসটিলেভ এবার ঘরে ঢুকে তার স্যুটকেস খুলে মায়ের একখানি ছবি বার করে হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে শেরিওঝার ঘরে দেওয়ালের গায়ে ঠুক ঠুক করে টানাতে লাগলো। একটু পরে মা ঘরে ঢুকে মৃদু হেসে বললো, 'ছবি দিয়ে আর কি হবে? আসল মানুষটিকেই তো এখন থেকে সব সময় কাছে পাবে।'

কোরোসটিলেভ এবার মায়ের হাতখানি তার হাতে তুলে নিয়ে দু'জনে কাছাকাছি দাঁড়ালো। কিন্তু ওর দিকে তাদের দৃষ্টি পড়তেই দু'জনে তক্ষুণি সরে গেল। মা ঘর থেকে বার হয়ে গেল, আর কোরোসটিলেভ একটা চেয়ারে বসে পড়ে ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'তাহলে শেরিওঝা আমি ত তোমাদের সঙ্গে থাকব বলে এসেছি, তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

'বরাবর থাকবে?'

'হাঁ, বরাবর।'

'আমাকে মারবে না তো?'

কোরোসটিলেভ অবাক হয়ে বললো এবার, 'কেন? মারব কেন?'

'আমি দুষ্টুমি করলে?'

'না, আমার মনে হয় দুষ্টুমি করলেও বাচ্চাদের মারধর করাটা খুব বোকামী।'

'হাঁ, ঠিক বলেছ, মারলে কান্না পায়, তাই না?' শেরিওঝা বেশ খুশী হয়ে উঠলো যেন।

কোরোসটিলেভ আবার বললো, 'আমরা দু'জন দু'জনকে বুঝতে চেষ্টা করব, কেমন ?'

'তুমি কোথায় ঘুমোবে ?' শেরিওঝা এবার অন্য প্রশ্ন করলো।

'মনে হচ্ছে এ ঘরেই ঘুমোব। হাঁ, শোন, আসছে রবিবার সকালে তুমি আর আমি এক জায়গায় যাব। কোথায় বল তো ? খেলনার দোকানে, তোমার যা খুশি নেবে, কেমন ?'

'সত্যি ? আমি তাহলে একটা সাইকেল চাই। রবিবারটা আসতে আর কত দেরি বলতো ?'

'আর দেরি নেই।'

'কতদিন আর ?'

'আসছে কাল তো শুক্রবার। তার পরের দিন শনিবার। তার পরের দিনটাই তো রবিবার।'

'উঃ! এ-ত দেরি এখনও ?' শেরিওঝা দুঃখভরা হতাশার সুরে বলে উঠলো।

তারপর ওরা তিনজন—শেরিওঝা, মা আর কোরোসটিলেভ খেতে বসল। পাশা মাসী আর লুকিয়ানিচ কোথায় বেড়াতে গেছে। শেরিওঝার বড্ড ঘুম পাচ্ছে এবার। চোখ দু'টি ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ঐ যে আলোটার চারদিক ঘিরে ছাই রঙের প্রজাপতিগুলো কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে, তারপর এক সময় টেবিলক্লথের ধারে ছোট্ট পাখা পত্ পত্ করতে করতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ছে, ওদের দেখে দেখে ওর যেন

আরও বেশী ঘুম পাচ্ছে। আচম্‌কা ও দেখল কোরোসটিলেভ যেন ওর খাটটা কোথায় নিয়ে চলেছে।

'আমার খাটটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' শেরিওঝা বললো। মাকে এবার বলতে শুনলো, 'ঘুমিয়ে পড়লে তো? এসো, হাত পা ধুয়ে শোবে এসো।'

ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গে ও কিন্তু প্রথমটা বুঝতেই পারছে না কোথায় আছে ও। দু'টো জানালার জায়গায় তিনটে দেখা যাচ্ছে কেন? বিছানার উল্টো দিকে তো কোন জানালা ছিল না! পর্দাগুলোও তো একেবারে অন্য রকম। তাহলে কি ও.........হাঁ, এবার বুঝতে পারছে মাসীর ঘরে ও শুয়েছে কাল। এ ঘরখানিও ভারী সুন্দর ভাবে সাজানো। জানালার তাকে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া রয়েছে। আয়নার পিছনে ঐ তো ময়ুরপুচ্ছের ঝাড়নটা ঝুলছে। মাসীদের বিছানা কেমন পরিপাটি করে পেতে রাখা হয়েছে। খোলা জানলার শার্সি দিয়ে ভোরবেলার সোনালী রোদ ঘরের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে। শেরিওঝা এবার সব বুঝতে পারল। বিছানা থেকে তড়াক করে উঠে পড়ে রাত-জামাটা একটানে খুলে ফেলে প্যান্টটা পরে খাবার ঘরের দিকে চললো। ওর ঘরের সামনে গিয়ে দেখে ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। বাইরে থেকে হাতলটা ঘোরাবার চেষ্টা করলো কত, কিন্তু দরজা খুললো না। তার সব খেলনা যে ও ঘরেই রয়েছে, তাই তাকে এখন ওঘরে না ঢুকলেই নয়। ওর ছোট্ট নূতন কোদালিটাও রয়েছে। হঠাৎ যেন তার অদ্ভুত একটা ইচ্ছে

হোল সে এখনই সেই কোদালিটা দিয়ে বাগানের মাটি খুঁড়বে।

শেরিওঝা এবার মাকে ডাকতে লাগলো, 'মা, মাগো, দরজা খোল।' দরজা তেমনই বন্ধ রইলো, ভেতরে সব চুপচাপ। আবার প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলো, 'মা, মা, মাগো।'……

মাসী কোথা থেকে দৌড়ে এসে এক হেঁচকায় ওকে টেনে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চললো। ফিস্ ফিস্ করে মাসী ওকে বলছে, 'এটা কি হচ্ছে শুনি? এত চেঁচাচ্ছ কেন? ছিঃ, এমন করতে নেই! তুমি কি এখনও ছোট্ট ছেলেটি আছ নাকি? মা ঘুমুচ্ছে, তার ঘুম ভাঙ্গাচ্ছ কেন?'

'আমি আমার কোদালিটা নেব।'

'নেবে তো নেবে। ওটা কি পালিয়ে যাচ্ছে নাকি? মা উঠলেই ওটা নিতে পারবে। এখন লক্ষ্মীছেলের মত এই গুলতিটা নিয়ে খেলা কর তো সোনা। গাজর খাবে? এই যে নাও, নিজে নিজে পরিষ্কার করে খাও। কিন্তু খাওয়ার আগে ভদ্রলোকেরা হাত মুখ ধুয়ে নেয় তা জান তো?'

কেউ আদর করে কথা বললে শেরিওঝা কেমন হয়ে যায়, তার কথা না শুনে পারে না। শান্ত ছেলের মত মাসীর হাতে হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ দুধ খেল ও। তারপর গুলতি হাতে নিয়ে বাইরে চলে এলো। রাস্তার ওধারে বেড়ার উপর ঐ যে একটা চড়ুই বসে আছে। ভাল করে তাক না করেই সে পাখীটার দিকে একটা গুলি ছুঁড়লো। পাখীটা ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। সে কিন্তু সব সময় লক্ষ্যহীন ভাবেই গুলি

ছোড়ে। সে জানে যে কারণেই হোক তার গুলি কখনও কোথাও ঠিক লাগবেনা। লক্ষ্য ঠিক করে তাক করেও জায়গা মত গুলি লাগাতে না পারলে লিডা ওকে ক্ষেপিয়ে পাগল করে দেবে। তাই ও যেমন তেমন যেখানে সেখানে গুলি ছুঁড়তেই ভালবাসে।

ওদিকে শুরিক ওর বাসার সামনে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। শেরিওঝাকে দেখে সে বললো, 'এসো না আমরা বনে বেড়িয়ে আসি।'

'বয়ে গেছে আমার বনে যেতে।'

দরজার সামনে বেঞ্চের ওপর শেরিওঝা এবার পা ঝুলিয়ে বসলো। আবার তার মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। উঠান দিয়ে আসবার সময় ও দেখেছে ওর ঘরের শার্সিগুলো পর্যন্ত বন্ধ। তখন সে কিছু মনে করে নি। এখন হঠাৎ তার মনে পড়লো গরমকালে কোনদিন তো ওদের ঘরের জানালাগুলো এরকম বন্ধ থাকে না! কেবল শীতকালে যখন চারদিকে বরফ পড়তে থাকে তখনই এমনভাবে দরজা জানালা বন্ধ থাকে। আজ এ কি হোল? খেলনাগুলো আনবার আর কোন উপায়ই নেই তাহলে। কিন্তু এই মুহূর্তে খেলনাগুলো পাবার জন্য তার মনটা এমন উতলা হয়ে উঠলো কেন? তার ইচ্ছে হচ্ছে আছড়ে পড়ে চীৎকার দিয়ে কাঁদে এখন। কিন্তু সে কি আর আগের মত ছোট্টটি রয়েছে নাকি? তাই এখন আর মাটিতে পড়ে কাঁদাও চলে না। কিন্তু বড় হলেও বা কি? মনটা তো মানছে না। সে যে এক্ষুণি এই মুহূর্তে তার

কোদালিটা চাইছে, মা ও কোরোসটিলেভ তো তা গ্রাহ্যই করছে না! সে ভাবতে লাগল, ওরা উঠলেই সে তার প্রত্যেকটি খেলনা ওঘর থেকে মাসীর ঘরে নিয়ে আসবে।

দেরাজ থেকে বাড়ি তৈরী করবার ব্লকটাও আনতে ভুলবে না। ভাস্কা আর ঝেঙ্কা ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লিডাও ছোট্ট ভিক্টরকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা সবাই শেরিওঝার

দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সে কোন কথা না বলে শুধু পা দোলাতে লাগলো। ঝেঙ্কা এবার প্রশ্ন করলো, 'কি হয়েছে তোমার ?'

ভাস্কা উত্তর দিল, 'জাননা বুঝি, ওর মা আবার বিয়ে করেছে।'

সবাই এবার চুপচাপ। একটু পরে ঝেঙ্কা বললো আবার, 'কাকে বিয়ে করেছে ?'

ভাস্কা বললো, 'ব্রাইট শোরের ডিরেক্টার কোরোস-টিলেভকে। গত মিটিংএ সে কি বকুনিই না খেল ?'

'কেন শুনি ?' ঝেঙ্কা জিজ্ঞেস করল।

'কোন কারণ ছিল নিশ্চয়ই' বলে ভাস্কা ওর পকেট থেকে দোমড়ানো একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। ঝেঙ্কা বলে উঠলো, 'আমাকে একটা দাও।'

'মাত্র দু'টোই আছে', বলে ভাস্কা নিজে একটা নিয়ে ঝেঙ্কাকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিল। তারপর নিজে সিগারেটটা ধরিয়ে ঝেঙ্কাকে আগুনটা দিল। উজ্জ্বল রোদে ছোট দেশলাইকাঠির শিখাটা দেখাই যাচ্ছিল না মোটে। সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী কেমন সুন্দর পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। মাটির উপরে দেশলাইর কাঠিটা জ্বলে পুড়ে বাঁকা আর কালো হয়ে গেল। রাস্তার এধারে ওরা যেখানে সবাই জড়ো হয়েছে সেখানটায় কেমন সোনালী রোদ চিক্‌মিক্ করছে। কিন্তু ওধারটায় এখনও রোদের দেখা নেই, কেমন ছায়া ছায়া। ওদিকটায় বেড়ার কাঁটাগাছের পাতায় শিশিরকণা

জমে টলমল করছে এখনও। রাস্তার ধূলায় গাড়ীর চাকার আঁকাবাঁকা ছুটো দাগ। কে যেন ট্রাক্টর চালিয়ে গিয়েছে ঐ রাস্তা দিয়ে। শেরিওঝা দেখছে আর ভাবছে, কী অদ্ভুত ব্যাপার।

লিডা শুরিককে ডেকে বলল, 'জান, শেরিওঝার মন খারাপ। ওর নূতন বাবা হয়েছে কিনা।'

ভাস্কা ওর দিকে চেয়ে সান্ত্বনার স্বরে বললো, 'না, না, এজন্য এত ভেবো না তুমি। ভদ্রলোককে তো বেশ ভালই মনে হোল। তুমি যেমন আছ তেমনই থাকবে। তোমার কি তাতে?'

শেরিওঝা হঠাৎ গতরাত্রের কথাটা মনে পড়ায় বলে উঠল, 'জান, উনি আমাকে একটা সাইকেল কিনে দেবেন বলেছেন।'

ভাস্কা বললো, 'সত্যি দেবে? না, এমনিই বলেছে?'

'সত্যি সত্যি দেবে। আমরা ছু'জনে আসছে রবিবার দোকানে যাব। কাল তো শুক্রবার তার পরের দিন শনিবার, তার পরেই তো রবিবার।'

ঝেঙ্কা বললো, 'ছু'চাকাওয়ালা সাইকেল তো? না, তিন চাকাওয়ালা বাচ্চাদের সাইকেল?'

ভাস্কা এবার বিজ্ঞের মত বলে উঠলো, 'না, না, বাচ্চাদের সাইকেল নিও না যেন। তুমি তো বড় হচ্ছ, এখন ছু'-চাকাওয়ালা সাইকেলই ভাল হবে।'

লিডা এতক্ষণ পর বললো, 'ও-সব বানিয়ে বলছে। ওকে সাইকেল দেবে না হাতী দেবে।'

গুরিক বলে উঠলো, 'আমার বাবাও আমাকে সাইকেল দেবে বলেছে। আসছে মাসে বেতন পেয়েই কিনে দেবে।'

কোরোসটিলেভের সংগে প্রথম দিন

বাগানের দিকে লোহার ঝনঝনানি শব্দ শুনতে পেয়ে শেরিওঝা ওদিকে তাকাল। কোরোসটিলেভ বাগানের ভেতর দাঁড়িয়ে ছিটকিনি টেনে টেনে খড়খড়ি খুলছিল। তার পরনে ডোরাকাটা শার্ট, গলায় নীল টাই, ভিজা চুলে পরিপাটি করে সিঁথি কাটা। সে খড়খড়ি খুলতেই মা ভেতর থেকে ধাক্কা দিয়ে জানালাটা খুলতে খুলতে কি যেন বললো। জানালার তাকে কনুই রেখে কোরোসটিলেভ তার জবাব দিল।

জানালা দিয়ে নিজেকে বেশ খানিকটা বাইরে বের করে দু'হাত দিয়ে তার মাথাটাকে জড়িয়ে ধরলো। ওরা দেখতে পেল না—যে ছেলেরা রাস্তা থেকে ওদের দেখতে পাচ্ছে। শেরিওঝা এবার দৌড়ে উঠানে গিয়ে বললো, 'কোরোসটিলেভ, আমার কোদালিটা দাও না?'

'কোদালি?'

'হাঁ, আমার সব খেলনাও আমি নিয়ে যাব।'

মা এবার ভেতর থেকে উত্তর দিল, 'ভেতরে এসে তোমার খেলনাগুলো নিয়ে যাও।'

শেরিওঝা এবার ঘরে ঢুকলো, কেমন অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে যেন। নিঃশ্বাসের সংগে

সংগে সেই মিষ্টি গন্ধটা ওর নাকে ঢুকে যাচ্ছে। কত কি জিনিস ঘরের এদিক ওদিক পড়ে রয়েছে, ব্রাশ, জামাকাপড়, সিগারেট আরও কত কি। মা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের বিনুনী খুলছে। একটু পরেই মায়ের একরাশ চুল পিঠ ছাড়িয়ে কোমরের নীচে অবধি ছড়িয়ে পড়লো। সত্যি, মায়ের চুল কী সুন্দর দেখতে! ওকে দেখে মা বললো, 'এসো শেরিওঝা।' ও কোন কথাটি না বলে অবাক হয়ে সিগারেটের বাক্সগুলির দিকে তাকিয়ে রইলো। বাক্সগুলো কী চকচকে আর সুন্দর! একটা বাক্স হাতে নিয়ে ও নাড়াচাড়া করছে। পাতলা কাগজের মোড়কে ওটা একেবারে বন্ধ, তাই খোলা যাচ্ছে না।

ও কি করছে মা আয়নার ভিতর দিয়ে দেখতে পেয়ে বললো, 'ওটা রেখে দাও শেরিওঝা। তুমি তোমার খেলনাগুলো নেবে না?'

বাড়ি তৈরী করবার ব্লকটা তো আলমারির দেরাজের পেছন দিকটায় রয়েছে। উঁকিঝুঁকি মেরে ও সেটাকে একটু একটু দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু দেরাজটা আরও টেনে না খুলতে পারলে তার ছোট্ট হাত যে নাগাল পাচ্ছে না। মা আবার বলে উঠলো, 'কি হচ্ছে? কি খুঁজছো বল তো।'

'ওটা আনতে পারছি না যে' শেরিওঝা বলল। এমন সময় কোরোসটিলেভ ঘরে ঢুকলো।

শেরিওঝা এবার তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঐ বাক্সগুলো খালি হলে আমায় দেবে?' ও জানে বড়রা ঐ

বাক্সগুলোর মধ্যে যে সাদা সাদা জিনিসগুলো থাকে সেগুলো খেয়ে ফেলে খালি বাক্সগুলোই বাচ্চাদের দিয়ে দেয়। কোরোসটিলেভ একটা বাক্স থেকে সব সিগারেট বার করে নিয়ে তক্ষুণি ওটা ওর হাতে দিয়ে বললো, 'এই যে নাও। কেমন খুশী তো।'

মা বলে উঠলো, 'ঐ দেরাজে ওর কি খেলনা আছে বের করে দাও তো।'

কোরোসটিলেভ তার বড় বড় হাত ছু'টো দিয়ে দেরাজটায় টান দিতেই, শব্দ করে পুরানো দেরাজটা খুলে গেল। শেরিওঝা এবার ছু'হাত বাড়িয়ে অনায়াসে ব্লকটা বার করে নিল। ওরে বাবা! কোরোসটিলেভ কত সহজে শক্ত দেরাজটা খুলে ফেললো! তারপর শেরিওঝা ওর সমস্ত খেলনা আর ব্লকের বাক্সটা ছু'হাতে বুকে চেপে ধরে মাসীর ঘরের মেঝেতে ওর খাট আর আলমারীর মাঝখানে এনে ফেললো। মা ওঘর থেকে ডেকে বলছে, 'কোদালিটা নিয়ে গেলে না? ওটার জন্যে এলে আর ওটাই ফেলে গেলে?'

শেরিওঝা নীরবে আবার ওঘরে ঢুকে কোদালিটা হাতে নিয়ে বাগানে বেরিয়ে এলো। না, এখন আর মাটি খুঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না তার। চকোলেটের উপরকার রাংতাগুলোকে নূতন সেই চকচকে বাক্সটায় গুছিয়ে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু মা একথা বলার পরে বাগানে একটুখানি মাটি না খুঁড়লেও যে নয়! আপেল গাছটার নীচে মাটিটা বেশ নরম আর ভিজে। সে ওখানটার মাটির বুকেই কোদালিটা যত জোরে সম্ভব গেঁথে

দিল। তারপর ছোট্ট হাত দিয়ে মাটির বুকে কোদালি চালাতে লাগলো। রোদে পুড়ে পুড়ে ওর তামাটে রঙের রোগা পিঠের এক দিকটা আর হাতের মাংসপেশীগুলো কোদালির চাপে ফুলে ফুলে উঠেছে। কোরোসটিলেভ সিগারেট খেতে খেতে বারান্দায় পায়চারি করছে আর তাকে দেখছে।

লিডা ভিক্টরকে কোলে নিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বললো, 'এসো, ফুলের গাছ লাগিয়ে দিই এখানে। বেশ চমৎকার দেখাবে।' আপেল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ভিক্টরকে সে এবার মাটির ওপর বসিয়ে দিল। কিন্তু ছেলেটা একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেল। লিডা এবার বিরক্ত হয়ে ভিক্টরকে এক ঝাকানি দিয়ে তুলে নিয়ে আবার সোজা করে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়ে পাকা গিন্নীর মত বললো, 'আর একটু ভাল হয়ে বসতেও পার না বোকা ছেলে? তোমার বয়সী সব বাচ্চারা কেমন সুন্দর বসতে পারে। তুমি একটা আস্ত হাঁদারাম।'

কোরোসটিলেভ বারান্দা থেকে যাতে ওর কথা শুনতে পায় লিডা এমনভাবেই চেঁচিয়ে কথাগুলো বললো। তারপর আড়চোখে একটিবার কোরোসটিলেভের দিকে তাকিয়ে ওধার থেকে কয়েকটি গাঁদা ফুলের চারা এনে সেই নরম মাটির বুকে পুঁতে দিতে লাগলো।

'বাঃ! কি সুন্দর দেখাচ্ছে দেখ!' লিডা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। তারপর লাল সাদা কতগুলো পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে এনে গাছগুলোর চারপাশে সাজিয়ে দিল। হাত দিয়ে

চাপড়ে চাপড়ে এবড়ো খেবড়ো মাটিকে সমান করে দিল। লিডার হাত দু'খানি কাদা মাটিতে একেবারে কালো হয়ে গেছে। শেরিওঝার দিকে তাকিয়ে ও আবার বললো, 'দেখ তো, এবার কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!'

'হাঁ, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে' শেরিওঝা মাথা নেড়ে বললো।

'তাহলে? আমি ছাড়া কোন্ কাজটা তুমি অত সুন্দর করতে পার শুনি?'

সেই মুহূর্তে ভিক্টর আবার ধপাস্ করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। লিডা সেদিকে তাকিয়ে বললো, 'বেশ হয়েছে। ওভাবেই শুয়ে থাক বোকা ছেলে।' ভিক্টর কিন্তু একটুও কাঁদলো না। বুড়ো আঙ্গুলটা মুখে পুরে দিয়ে চুষতে চুষতে উপরের দিকে তাকিয়ে অবাক দৃষ্টিতে গাছের পাতাগুলোকে দেখছে শুধু। লিডা এবার কোমর থেকে বেল্টের মত বাঁধা রশিটা খুলে নিয়ে বারান্দার সামনে এসে লাফাতে সুরু করলো। এক, দুই, তিন·······জোরে জোরে বলতে বলতে ও লাফিয়েই চললো। কোরোসটিলেভ ওর কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো।

শেরিওঝা এবার লিডার দিকে চেয়ে বলে উঠলো, 'দেখ, দেখ, বাচ্চাটার গায়ে কেমন পিঁপড়ে উঠেছে।' লিডা লাফানো ছেড়ে এক দৌড়ে ভিক্টরের কাছে এসে ওকে টেনে তুলে গায়ের পিঁপড়ে ঝাড়তে ঝাড়তে বিরক্তিভরা সুরে বললো, 'আঃ! জ্বালিয়ে খেল ছেলেটা! সারাক্ষণ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলেও এটার গায়ে নোংরা লেগে থাকবেই দেখছি!'

মা বারান্দা থেকে হাঁক দিল, 'শেরিওঝা, এদিকে এসো এবার। পোশাক বদলে নাও। আমরা বেড়াতে বার হবো।'

শেরিওঝা একলাফে উঠে দৌড়ে গেল। বেড়াতে যেতে ওর বড্ড ভালো লাগে। কারও বাড়ি বেড়াতে গেলে কী মজাটাই না হয়! ওরা কত খাবার, মিষ্টি আর খেলনা দেয় ওকে! মা বললো, 'আমরা তোমার দিদিমাকে দেখতে যাচ্ছি, বুঝলে?' কোথায় কার কাছে যাচ্ছে তা জেনে ওর কি লাভ। যে কোন এক জায়গায় বেড়াতে গেলেই হোল।

এই দিদিমাটিকে আগে সে এখানে সেখানে কয়েকবার দেখেছে। উনি দেখতে বড্ড গম্ভীর আর রাশভারি। একটা সাদা বুটিদার রুমাল তাঁর থুতনি থেকে মাথা পর্যন্ত আঁটসাঁট করে বাঁধা থাকে সর্বদা। মাঝে মাঝে উনি আবার গলায় একটা মেডেলও পরেন। মেডেলটার ওপর লেনিনের ছবি খোদাই করা আছে। দিদিমার হাতে সর্বদা একটা কালো বড় ব্যাগ থাকবেই। সেটা থেকে চকোলেট বার করে উনি ওকে কতদিন দিয়েছেন। কিন্তু এর আগে কোনদিন তারা দিদিমার বাড়ি বেড়াতে যায় নি।

আজ ওরা তিন জনেই সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরে নিল। পথে বেরিয়ে মা আর কোরোসটিলেভ দু'দিক থেকে দু'জনে ওর হাত ধরে হাঁটতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই ও কিন্তু ওদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজে নিজে পথ চলতে শুরু করলো।

নিজে নিজে হাঁটা কী মজা! পথের এধারে ওধারে কত

কি দেখতে দেখতে চলা যায়। ইচ্ছে হলে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায় আবার ওদের থেকে পিছিয়েও পড়া যায়। একটা ইঞ্জিনের মত হুস্ হুস্ শব্দ করতে করতে বা পথের ধারের ঘাসের শীষ তুলে মুখে ঢুকিয়ে শিস্ দিতে দিতে যেমন খুশি চল। পথের উপরে হঠাৎ হয়তো কারও হারিয়ে যাওয়া পয়সাও কুড়িয়ে পেলে। বড়দের হাত ধরে চললে কি এসব করা চলে নাকি? না, তাতে কোন মজা থাকে? ওদের হাত ধরে চললে হাত তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘেমে ভিজে উঠবে আর পথ চলবার কোন আনন্দই যে থাকবে না তখন।

তারপর ওরা বড় রাস্তার উপর একটা ছোট্ট বাড়ির মধ্যে ঢুকল। বাড়িটা যেমন ছোট, উঠানটাও তেমনই ছোট। রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই দিদিমা এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালেন। দিদিমা বললেন, 'এসো, এসো সুখে থাকো, আমার আশীষ নাও।'

শেরিওঝা শুনে ভাবল তাহলে আজ নিশ্চয়ই ছুটির দিন। পাশা মাসীর মত শেরিওঝাও বলল, 'তুমিও নাও।' শেরিওঝা বসবার ঘরে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে দেখলো কোথাও কোন খেলনা নেই; এমন কি ঘর সাজাবার পুতুলও নেই, সুন্দর জিনিস নেই; শুধু খাবার আর শোবার জন্য একঘেয়ে প্রাণহীন কতগুলি আজে বাজে সরঞ্জাম এদিক ওদিক ছড়ানো রয়েছে। দিদিমার দিকে তাকিয়ে ও বললো, 'তোমার কোন খেলনা নেই?' (হয়তো খেলনা বা পুতুল অন্য কোথাও তুলে রেখেছে।)

দিদিমা বললো, 'না, খেলনা টেলনা আমার এখানে কিছু নেই বাছা। তোমার মত কোন বাচ্চা নেই তো। এসো, তোমার জন্য এই যে টফি রেখেছি, খাও।'

টেবিলের উপর একরাশ পিঠে আর কেকের সঙ্গে একটা লাল কাঁচের পাত্রে কতগুলো টফিও রয়েছে। সবাই এবার টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে বসে পড়লো। কোরোসটিলেভ বসেই একটা বোতলের ছিপি খুলে গ্লাসে গাঢ় লাল রঙের মদ ঢেলে নিল। মা বললো, 'শেরিওঝা কিন্তু ওসব খাবে না।'

এটা অবশ্য জানা কথা। ওরা সব সময় নিজেরা যখন তখন ঐ রঙীন জল বেশ মজা করে খাবে কিন্তু তাকে কখনও দেবে না। কোনরকম ভাল একটা কিছু বাড়িতে এলেই তার সেটা খাওয়া বারণ, এতো সে বরাবর দেখে আসছে।

কিন্তু আজ কোরোসটিলেভ বললো, 'ওকে একটুখানি দেব ভাবছি। তাহলে ও আমাদের স্বাস্থ্যপান করতে পারবে।' ছোট্ট একটা গ্লাসে এবার সে বোতল থেকে সামান্য একটুখানি ঢেলে ওর হাতে দিল। শেরিওঝার মনে হল কোরোসটিলেভের সঙ্গে ভালভাবেই থাকা যাবে তাহলে।

সবাই এবার পরস্পর গ্লাসগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে ঠুং করে ঠেকাতে শেরিওঝাও তার ছোট্ট গ্লাসটিকে ওদের গ্লাসের সঙ্গে ঠেকিয়ে নিল।

ওদের সঙ্গে আজ আর একটি দিদিমাও আছেন। উনি নাকি শুধু দিদিমা নন, বড়দিদিমা। ওকে বড়দিদিমণি বলে ডাকতে বলে দিয়েছে ওরা। কোরোসটিলেভ ওকে শুধু

দিদিমা বলেই ডাকছে, শেরিওঝার কিন্তু ওকে একটুও ভাল লাগছে না। লাল জলের গ্লাসটা তাকে দেওয়া হলে এই বড় দিদিমাই বললো, 'টেবিল-ক্লথের ওপর সে ওটা ফেললো বলে।'

ওদের গ্লাসের সঙ্গে তার গ্লাসটা ঠেকাতে গিয়ে সত্যি কিন্তু কয়েক ফোঁটা উপ্‌ছে টেবিল-ক্লথের ওপর পড়ে গেল। তখন বড়দিদিমা বলে উঠলো, 'দেখলে তো? আমি ঠিক বলেছি কিনা।' তারপর নূনের পাত্র থেকে কিছুটা নূন নিয়ে সেই ভিজে জায়গায় দিয়ে রাগে গর্‌গর্‌ করতে লাগলো যেন। তার পর থেকে বড়দিদিমা একদৃষ্টে তাকেই দেখছে কেবল। ওর চোখে একজোড়া চশমাও রয়েছে আবার, বুড়ী কিন্তু একেবারেই বুড়ো থুড়্‌ থুড়ে। তামাটে রঙের হাত দু'খানি কুঁচকে এবড়োখেবড়ো হয়ে গেছে। লম্বা টিকালো নাকটা একদিকে একটু হেলে আছে। থুতনিটা এককালে বোধহয় বেশ ভরাট ছিল। এখন কেমন চিম্‌সে চুপ্‌সে গেছে যেন।

লাল জলটা সত্যি কী মিষ্টি খেতে! এক চুমুকে সে সবটা গিলে ফেললো।

তাকে একটা প্লেটে করে পিঠেও দেওয়া হয়েছে। পিঠেটা চটকে চটকে সে খেতে আরম্ভ করলো।

বড়দিদিমাটা আবার বলে উঠলো, 'কেমন করে খেতে হয় তাও জান না বুঝি?'

এ কথায় ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে সে চেয়ারটাকেই বেদম নাড়াতে আরম্ভ করলো।

বুড়ী আবার ধমকে উঠলো, 'এই দুষ্টু ছেলে, ঠিক হয়ে ভদ্র ভাবে বসতেও জান না ?'

এদিকে তার পেটে গরম লাগছে। চীৎকার করে গান গাইতে ইচ্ছে করছে তার, তাই হঠাৎ সে গান স্থুরু করলো।

বড়দিদিমা বলে উঠলো, 'আঃ! শিক্ষাসহবত এতটুকুও নেই নাকি ?'

কোরোসটিলেভ শেরিওঝার পক্ষ নিয়ে বললো, 'ওকে ক্ষেপাচ্ছ কেন বল তো ? বেচারীকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

বড়দিদিমা আবার বললো, 'একটু সবুর কর না, দেখো ও ছেলে আরও কি করে!'

বুড়ীও কিন্তু ঐ রঙীন জল বেশ অনেকটা খেয়ে ফেলেছে, ওর চোখ দু'টো চশমার ভিতর দিয়ে কী জ্বল্ জ্বল্ করছে!

শেরিওঝা এবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'যাও, যাও, তোমাকে আমি একটুও ভয় পাইনা।'

মাকে সে বলতে শুনলো, 'কী কাণ্ড করছে ছেলেটা!'

কোরোসটিলেভকে বলতে শুনলো, 'তোমরা বড্ড বাজে বক্‌বক্ কর কিন্তু, খেয়েছে তো এই একফোঁটা। এক্ষুণি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

শেরিওঝা আচম্‌কা তার ছোট্ট গ্লাসটির ওপর খালি বোতলটা উপুড় করে তুলে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'হাঁ আমি আরও খাব, খাবতো।' অন্য হাতে টেবিল-ক্লথটা একটু টানতেই বাসনগুলো সব ঝন্‌ঝন্ করে উঠলো। মার দিকে

চোখ পড়তেই সে দেখলো, মা কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। আর বড়দিদিমা টেবিলে কিল মেরে চীৎকার করছে, 'কেমন, হয়েছে তো? কী কাণ্ডটাই না করছে!' কিন্তু শেরিওঝার যে এখন দোলানি খেতে ইচ্ছে করছে। তাই সে এদিক ওদিক দুলতে সুরু করলো। টেবিলের ওপর পিঠে, কেক, মিষ্টি, গ্লাস, প্লেট সমস্ত কিছু কেমন তার চোখের সামনে দুলছে। বাঃ! বেশ মজা তো! মা, কোরোসটিলেভ, দিদিমা, এমন কি বুড়ীদিদিমাটাও যেন দোলানো চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। শেরিওঝার এবার হাসি পাচ্ছে কিন্তু, হো হো করে কেবলই হাসতে ইচ্ছে করছে। হঠাৎ সে শুনতে পেল কে যেন গান করছে। একি, বড়দিদিমা গান করছে যে! তোবড়ানো হাতে চশমাটি রেখে দু'হাত নেড়ে নেড়ে অদ্ভুত ভঙ্গী করে বুড়ী কেমন গান গেয়ে চলেছে দেখ! সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে কাটিয়ুশা যে গান গেয়েছিল এ সেই গান। শুনতে শুনতে কখন সে একটা পিঠের ওপর মাথাটি রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন দেখলো বড়দিদিমা ওখানে নেই, অন্য সবাই চা খাচ্ছে। ওরা শেরিওঝার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

মা প্রশ্ন করছে, 'কেমন? একটু ভাল বোধ করছো তো? আর চেঁচামেচি করবে না তো? ওঃ! কী কাণ্ডটাই না করছিলে!'

শেরিওঝা এবার অবাক হয়ে ভাবলো,—সে কি! আমি আবার চেঁচালাম কখন? মা কি বলছে যা তা?

মা এবার ব্যাগ থেকে একটা চিরুনি বের করে ওর চুল আঁচড়ে দিতে লাগলো। দিদিমা বললো, 'এই যে, মিষ্টিটা খাও।'

রঙ-ওঠা পর্দাটার পিছনদিকে পাশের ঘরে কে যেন ভোঁস ভোঁস করে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। শেরিওঝা এবার আস্তে পর্দাটা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখলো, ওমা, এ যে বড়দিদিমা বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে আর অমন বিদ্ঘুটে ভাবে নাক ডাকছে।

সে এবার এঘরে এসে ওদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাড়ি যাব। আর ভাল লাগছে না আমার।'

বিদায় নেবার সময় সে শুনলো কোরোসটিলেভ দিদিমাকে 'মা' বলে ডাকছে। কোরোসটিলেভের আবার মা আছে তাতো সে এতদিন জানতো না! সে ভেবেছে ওরা এমনিতেই দু'জন দু'জনকে চেনে শুধু।

এবার তারা বাড়ি ফিরে চললো। কিন্তু পথটা বড় লম্বা আর একঘেয়ে মনে হচ্ছে এখন। একটুও হাঁটতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু। কোরোসটিলেভ তো এখন ওর বাবা, তবে কেন ওকে কোলে করে নিচ্ছে না? অন্য সকলের বাবারা তো তাদের ছেলেদের কত সময় কাঁধে করে নিয়ে যায়। বাবার কাঁধে চড়ে ছেলেদের কতই না আনন্দ হয়, আবার গর্বেও বুক ভরে ওঠে। বাবার কাঁধে উঠলে পথের এদিক ওদিক সমস্ত কিছু সুন্দর স্পষ্ট দেখাও যায়। তাই সে বলেই ফেললো, 'আমার পা ব্যথা করছে যে!'

মা বললো, 'আর একটুখানি পথ আছে, আমরা প্রায় এসেই পড়েছি। এটুকু পথ বেশ হাঁটতে পারবে।'

কিন্তু শেরিওঝা কোরোসটিলেভের সামনে গিয়ে তার হাঁটু দু'টো জড়িয়ে ধরলো ওর ছোট্ট দু'খানি হাত দিয়ে।

মা ধমকে বলে উঠলো এবার, 'এত বড় ছেলে কোলে উঠতে চাও? ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জার কথা!' কোরোসটিলেভ কিন্তু তক্ষুণি ওকে দু'হাতে তুলে নিয়ে তার চওড়া কাঁধের ওপর ওকে বসিয়ে দিল।

উঃ! নিজেকে কী উঁচু মনে হচ্ছে এবার! কিন্তু সে এতটুকুও ভয় পাচ্ছে না। একটা পুরানো শক্ত দেরাজকে এক হেঁচকা টানে যে এক মুহূর্তে খুলে ফেলতে পারে সে কি কখনও তাকে কাঁধ থেকে ফেলে দিতে পারে? সে নির্ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে আর রাস্তার এধারে ওধারে লোকের বাড়ির উঠানে, এমন কি বাড়ির ছাদে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখতে পাচ্ছে। ভারী মজার ব্যাপার কিন্তু! সারাটা পথ এভাবে কত কি মজার জিনিস দেখতে দেখতে সে মনের আনন্দে, কাঁধে চড়ে চলেছে। তার বয়সী কত ছেলেরা হেঁটে যাচ্ছে। ওদের দেখে তার যে ওদের জন্য একটু কষ্ট না হচ্ছে তাও নয়, আবার অহংকারেও বুকটা ভরে উঠছে। বাবার কাঁধে চড়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে এমনি করে বাড়ি ফেরার মধ্যে কী যে মজা আজই যেন সে প্রথম বুঝতে পারলো।

সাইকেল কেনা হ'ল

রবিবার আবার সেই কাঁধে চড়ে সে সাইকেল কিনতে চললো।

রবিবারটাও হঠাৎ যেন এসে পড়লো। আর এসে পড়তেই সে আনন্দে উত্তেজনায় পাগল হয়ে উঠলো।

কোরোসটিলেভকে প্রশ্ন করলো, 'আজকের কথা মনে আছে তো?'

'নিশ্চয়ই মনে আছে, অতবড় দরকারী কথা ভুলতে পারি নাকি? দু'একটা হাতের কাজ সেরেই আমরা যাব।'

এই কাজের কথাটা একেবারেই কিন্তু বাজে। শুধু মায়ের সঙ্গে বসে বসে গল্প করা ছাড়া তার কোন কাজই করবার নেই। আর এই কথা বা গল্পও কেমন যেন একঘেয়ে আর বোকা বোকা। কিন্তু ওরা দু'জনেই এরকম কথা বলতেই বেশ ভালবাসে তা বোঝা যায়। কারণ ওরা কথা বলতে আরম্ভ করলে আর শেষ করতে চায় না। বিশেষ করে মা তো একই কথা বারবার বলবেই। ক'বার শেরিওঝা ওদের দু'জনের এপাশ ওপাশ থেকে নীরবে লক্ষ্য করেছে, ওরা দুজনে চুপি চুপি একটা কথাই কেবল বলে যাচ্ছে।

সে শুধু অবাক হয়ে ভাবে কখন ওরা ক্লান্ত হয়ে এরকম বক্‌বকানি বন্ধ করবে!

মা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে, 'তুমি এত দরদী......তোমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে সবকিছু বুঝতে পার বলেই আমি এত সুখী হয়েছি......।'

কোরোসটিলেভও মৃদুস্বরে বলছে, 'সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে দেখবার আগে এসব বিষয় আমি অন্তর দিয়ে ঠিক বুঝতে পারিনি। কত জিনিসই বুঝতে পারতাম না আগে —কবে থেকে বুঝতে পারলাম বল দেখি? ঠিকই বুঝতে পারছ তো?......' তারপর ওরা দু'জন দু'জনের হাত ধরলো শক্ত করে।

মা বললো, 'তখন আমি ছিলাম ছোট, ভাবতাম আমি খুব সুখে আছি। তারও পর মনে হতো দুঃখে একেবারে মরে যাব। আজ কিন্তু সে সব স্বপ্ন মনে হচ্ছে।'

কোরোসটিলেভের দুই হাতের মধ্যে নিজের মুখখানি লুকিয়ে মা কেবলই কি একটা কথা বিড়বিড় করে বলছে এবার।

কিছুক্ষণ পর সে মাকে বলতে শুনলো, 'আমি যেন মধুর একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, ঘুমের আবেশে শুধু যেন একটা সুখ-স্বপ্ন। তারপর যেন হঠাৎ সেই ঘুম ভেঙ্গে জেগে দেখি তুমি...তুমি রয়েছ আমার পাশে, একান্ত কাছটিতে।'

কোরোসটিলেভ মাকে কথা বলতে না দিয়ে বলে উঠলো, 'আমি তোমায় ভালবাসি।'

মা কিন্তু তার কথায় এতটুকুও বিশ্বাস করতে পারছে না। বারবার কেবল বলছে, 'সত্যি বলছো ? সত্যি ভালবাস ? বল না গো...'

'ভালবাসি, প্রাণ দিয়ে ভালবাসি...'

'সত্যি ভালবাস ?'

মা যেন কি ! বারবার একটা কথাই বলছে কেন ? কোরোসটিলেভই বা দিব্যি করে কিংবা ভয়ানক একটা শপথ করে কথাটা বলছে না কেন ? তাহলে ত মা আর অবিশ্বাস করতে পারবে না। এবার কোরোসটিলেভ কোন কথা না বলে মা'র দিকে অপলক তাকিয়ে আছে শুধু। বোধ হয় তার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। কথা বলতে বলতে এবার হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মাও কেমন তার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে। উঃ, ওরা ত্ু'জন ত্ু'জনের দিকে এমনি করে আর কতক্ষণ তাকিয়ে থাকবে ? অনেকক্ষণ পর মা আবার চুপি চুপি বললো, 'আমি তোমায় ভালবাসি।' এ যেন একটা খেলা। একই কথা কতবার কতভাবে বলা। সে ভাবতে লাগলো, ওরা কখন এসব একঘেয়ে বাজে কথা বন্ধ করবে ? ওরা চুপ করছে না কেন ?

কিন্তু সে জানে বড়রা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে তখন তাদের কোনমতেই বিরক্ত করা চলে না। ওটা ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। সে যদি এখন ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলে না জানি ওরা রেগে কি করবে। একপাশে চুপটি করে এমনি দাঁড়িয়ে থেকে মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করে

নিঃশ্বাস ফেলে সে যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সে কথাটা ওদের বুঝিয়ে দেওয়া ছাড়া কিছুই তো সে করতে পারে না। আর এমনিভাবে চুপচাপ পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকা কী যে কষ্ট!

কিন্তু আর কিছুক্ষণ পর তার কষ্টের শেষ হল মনে হয়। কোরোসটিলেভ শেষ পর্যন্ত মাকে বললো, 'আমাকে একঘণ্টার জন্য একটু বাইরে যেতে দাও মারিয়াশা! শেরিওঝা আর আমি একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি।'

তারপর কোরোসটিলেভের কাঁধে চড়ে ভাল করে চারদিকে তাকাবার আগেই সে খেলনার দোকানে পৌঁছে গেল। কোরোসটিলেভের পা দু'টো কি লম্বা আর কি তাড়াতাড়িই না চলে! আশ্চর্য! দোকানের দরজায় পৌঁছে কোরোসটিলেভ তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে দু'জনে ভেতরে ঢুকলো।

ওঃ! কত রকমারি সুন্দর সুন্দর খেলনা চারদিকে! ফোলা ফোলা গালের ঐ যে একটা ডল পুতুল তার দিকে তাকিয়ে হাসছে যেন! ওটার ছোট্ট পা দু'খানিতে আবার চামড়ার জুতোও পরানো রয়েছে যে! একটা লাল রঙের ড্রামের উপর নীল ভালুকের গোটা একটা পরিবার আরামে বসে আছে। একটা শিঙা সোনার মতন ঝিকমিক করছে। আরও কত কি খেলনা ছড়ানো রয়েছে এদিকে ওদিকে। কোনদিকে তাকাবে, কোন্‌টা দেখবে! আশায় আনন্দে সে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে যেন। ভেতর থেকে একটা বাজনার সুর ভেসে আসছে। উঁকি মেরে দেখে একটা লোক

একটা একর্ডিয়ান খেয়াল-খুশিমত প্যাঁ পোঁ করে টানছে আর বন্ধ করছে। ওটার ভিতর থেকে কান্নার মত একটা যন্ত্রণার সুর বেজে উঠছে শুধু। তারপরই আবার থেমে যাচ্ছে। এবার মিষ্টি গানের হালকা সুর শুনতে পেল সে। রবিবারের পোশাক-পরা কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছে। কাউণ্টারের ওপাশে এক বুড়ো দোকানী দাঁড়িয়ে আছে। কোরোসটিলেভকে দেখে সেই লোকটা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, 'কি দেখবেন?'

'এই বাচ্চার জন্য একটা সাইকেল দেখান।'

লোকটা ঝুঁকে পড়ে শেরিওঝাকে এক পলক দেখে নিয়ে বললো, 'তিন চাকার সাইকেল তো?'

শেরিওঝা তক্ষুণি বলে উঠলো, 'না, না, তিন চাকার সাইকেল আমি নেব না।' লোকটা যেন কী! তিন চাকার সাইকেল দিয়ে তার কি হবে?

লোকটা এবার চেঁচিয়ে 'ভারিয়া' বলে হাঁক দিল। কিন্তু কেউ এলো না, আর বুড়োটাও তার কথা ভুলে গিয়ে ঐ লোকগুলোর কাছে গিয়ে এটা ওটা কি করছে। মিষ্টি মজার গানের সুর বন্ধ হয়ে গেছে। তার বদলে কেমন একটা দুঃখের গান বাজতে লাগলো। একি, ওরা কেন এখানে এসেছে সে কথা নিঃশেষে ভুলে গিয়ে কোরোস-টিলেভও যে লোকগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ওরা সবাই এক মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছে কে জানে! শেরিওঝা এবার অধৈর্য হয়ে কোরোসটিলেভের

জ্যাকেট ধরে টান দিল—সে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'আঃ! কী সুন্দর গান!'

শেরিওঝা চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমাদের সাইকেল দেবে না নাকি?'

বুড়ো আবার চীৎকার করলো, 'ভারিয়া!' এখন তাহলে ভারিয়া নামে লোকটার উপরেই নির্ভর করছে সে সাইকেল পাবে কি পাবে না।

যাক, শেষ পর্যন্ত কাউন্টারের পেছনে তাকের পাশে ছোট্ট দরজাটি দিয়ে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকলো। বোঝা গেল ওরই নাম ভারিয়া। ভারিয়া একটা পাঁউরুটি চিবোতে চিবোতে এগিয়ে এলো। বুড়ো শেরিওঝাকে দেখিয়ে তাকে এবার বললো, 'গুদাম ঘর থেকে এই ভদ্রলোকটির জন্য একটা সাইকেল নিয়ে এসো তো।' হ্যাঁ, ওকে বাচ্চাছেলে না বলে এরকম ভদ্রলোক বলাটাই তো সত্যিকারের ভদ্রতা।

গুদাম ঘরটা মনে হচ্ছে পৃথিবীর অপর প্রান্তে! ভারিয়া যে গেল আর আসার নাম নেই। বাজনাটা নিয়ে টুংটাং করছিল যে লোকটা, তার ওটা কেনা হয়ে গেল। কোরোসটিলেভ একটা গ্রামোফোন কিনলো। গ্রামোফোন যন্ত্রটা কী অদ্ভুত! একটা বাক্সের উপর কালো একটা প্লেটের মত কি বসিয়ে দিলেই প্লেটটা ঘুরতে ঘুরতে তোমার খুশিমত মজার বা দুঃখের যে কোন একটা গান বাজতে সুরু হয়ে যাবে। কাউন্টারের ওপর ওরকম একটা বাক্সেই এতক্ষণ গানটা

বাজছিল। কোরোসটিলেভ কাগজে মোড়ানো এক গাদা প্লেটের মত ঐ জিনিসগুলোও কিনলো। দু'বাক্স ছুঁচের মত পিন না কি বলে ওগুলোকে, তাও নিল। শেরিওঝার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সে বললো, 'তোমার মার জন্য এই উপহারটা কিনলাম।'

সবাই বুড়োর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে কেমন করে সে জিনিসগুলো সব বেঁধে ছেঁদে দিচ্ছে। তারপর ভারিয়া যেন পৃথিবীর ওপার থেকে সাইকেল নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। স্পোক, বেল, দু'টো হাতল, পাদানি, বসবার জন্য চামড়ার গদি আর একটা ছোট্ট লাল আলোও আছে তাতে। সত্যিকারের একটা সাইকেল চোখের সামনে দেখে শেরিওঝা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো শুধু। সাইকেলটার পেছনে হলদে রঙের টিনের প্লেটের ওপর চার অক্ষরের একটা নম্বরও লেখা রয়েছে যে! বুড়ো এবার সাইকেলটা হাতে নিয়ে বলতে সুরু করলো, 'দেখুন, জিনিসটা কী চমৎকার! এমন জিনিস আর অন্য জায়গায় পাবেন না। এই যে, সামনের চাকাটা ঘোরান, ঘণ্টাটা বাজান, পাদানিতে চাপ দিন, দেখুন, ভাল করে দেখুন না সব। সিত্য জিনিসটা খুব সুন্দর আর মজবুত। ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন, জীবনভর আমাকে ধন্যবাদ জানাবেন।'

কোরোসটিলেভ সাইকেলটা হাতে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। শেরিওঝা অবাক বিস্ময়ে শুধু হাঁ করে দেখছে আর ভাবছে—এই অপূর্ব সুন্দর জিনিসটা

তাহলে ওরই জন্য কেনা হোল ? এ যেন ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

তারপর সে সেই সাইকেলে চেপেই বাড়ি ফিরলো। অর্থাৎ চামড়ার নরম গদিতে বসে ছোট্ট দু'হাতে হাতল দু'টি আঁকড়ে ধরে, বেয়াড়া পাদানিতে পা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে সে খুশী মনে সাইকেলের ওপর বসে আছে আর কোরোস-টিলেভ প্রায় কুঁজো হয়ে সাইকেল শুদ্ধ ওকে টেনে নিয়ে চলেছে। বাড়ির দরজা পর্যন্ত সে ওকে টেনে এনে সাইকেল-টাকে বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে বললো, 'এবার নিজে নিজে চড়বার চেষ্টা কর, আমি ত ঘেমে গিয়েছি।'

কোরোসটিলেভ এবার বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। ঝেঙ্কা, লিডা আর শুরিক ওদিক থেকে শেরিওঝাকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে এলো। শেরিওঝা ওদের দিকে তাকিয়ে গর্বভরা সুরে বললো এবার, 'আমি এরই মধ্যে এটা চালাতে শিখে গেছি। সরে যাও, সরে যাও তোমরা। না হয় চাপা দেব কিন্তু।' শেরিওঝা সাইকেলটায় চেপে একটু চালাবার চেষ্টা করতেই ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে গেল। 'ওঃ!' বলেই সে তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে হাসতে চেষ্টা করলো। যেন এতে ওর কিছুই হয়নি। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললো, 'হাতলটা উল্টো দিকে ঘুরিয়েছি কিনা তাই এমনটি হোল। আর পাদানিতে পা দেওয়া তো কী মুশকিল!'

ঝেঙ্কা উপদেশ দিল, 'জুতো খুলে ফেল। খালি পায়ে বেশ সুবিধে হবে। তাহলে পায়ের আঙ্গুল দিয়ে পাদানি চেপে ধরতে পারবে। দেখি, একটু আমি চড়ি, শক্ত করে ধরে রাখ দেখি—আরও শক্ত করে' ; ঝেঙ্কা এবার সাইকেলের ওপর উঠে বসলো। সবাই মিলে সাইকেলটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেও ঝেঙ্কা ওটা চালাতে চেষ্টা করতেই শুধু একা নয়, শেরিওঝাকে নিয়েই আছাড় খেল।

লিডা এবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'এবার আমি চড়বো!'

শুরিক বললো, 'না, না, আমি।'

ঝেঙ্কা গা ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, 'এখানটায় কী ধুলো। তাই এখানে চালানো শেখা যাবে না। এসো, আমরা ভাস্কাদের গলিতে গিয়ে শিখি।'

ভাস্কাদের বাগানের পেছনে একটুখানি খালি সবুজ জমি, তারই গায়ে একটা কাণাগলিকে ওরা বলত ভাস্কাদের গলি। তার একদিকে উঁচু বেড়া দেওয়া শালের বাগান। নরম সবুজ ঘাসে মনে হয় জায়গাটায় যেন সুন্দর গালিচা বিছানো রয়েছে। খেলাধুলোর পক্ষে জায়গাটা ভারী চমৎকার, কারণ বড়রা কেউ এখানে বিরক্ত করে না। তিমোখিনদের বাড়ির সীমানার বেড়া পর্যন্ত এসে জায়গাটা শেষ হয়ে গেছে। ভাস্কার মা আর শুরিকের মা দু'জনেই তাদের বেড়া ডিঙ্গিয়ে গোবর মাটি নোংরা সমস্ত কিছু এদিকটায় ফেললেও জায়গাটার মালিকানা স্বত্ব নিয়ে তারা

কেউ কখনও বাদানুবাদ করেনি। সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছে এটা ভাস্কাদেরই গলি। ঝেঙ্কা, লিডা, শুরিক সবাই মিলে সাইকেলটাকে টানতে টানতে ভাস্কাদের গলিতে নিয়ে চললো। শেরিওঝা বেচারি ওদের পেছন পেছন ছুটতে লাগলো। চলতে চলতে ওরা কে আগে শেখবে সেই নিয়ে তুমুল তর্ক সুরু করলো। ঝেঙ্কা বললো সে ওদের মধ্যে বয়সে বড়, তাই আগে শিখবার অধিকারটা একমাত্র তারই। তারপর লিডা, তারপর শুরিক। সবশেষে শেরিওঝাকে দিল চড়তে। কিন্তু একটু পরেই ঝেঙ্কা চেঁচিয়ে উঠলো আবার, 'নাও, হয়েছে। এবার আমার পালা'। এত তাড়াতাড়ি সাইকেলটা ছেড়ে দিতে শেরিওঝার মন চায় না, ছোট্ট ছোট্ট হাত-পা দিয়ে সে সাইকেলটাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'না, না, আমি আরও একটু চড়বো। এটা তো আমার সাইকেল।'

শুরিক তখনই বলে উঠলো, 'কি ছোটলোক!'

লিডাও বিশ্রী মুখভঙ্গি করে ওকে ভেংচাতে লাগলো, 'কী কিপ্টে বাবা, কি ছোটলোক।' কৃপণ, নিজের জিনিস আঁকড়ে থেকে ছোটলোক হওয়ার মত লজ্জার ব্যাপার আর কি হতে পারে? আর একটিও কথা না বলে শেরিওঝা সাইকেলটা ছেড়ে দিল। তারপর তিমোখিনদের বাড়ির বেড়ার সামনে গিয়ে ওদের দিকে পেছন ফিরে কাঁদতে লাগলো। সে এখন সমস্ত প্রাণমন দিয়ে সাইকেলটাকে নিজের করে পেতে চাইছে আর ওরা বয়সে বড় বলে, ওদের গায়ের জোর তার চেয়ে অনেক বেশী বলে তাকে তারা আমলই দিতে

চাইছে না, এটা কিন্তু ভারী অন্যায়। তাই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু ওরা কেউ তার দিকে একবার ফিরেও তাকালো না।

ওদের মাতামাতি চীৎকার আর সাইকেলটার ঝন্‌ঝনানি শব্দ সে পেছনে ফিরেও ঠিক শুনতে পাচ্ছে। কেউ তাকে ডাকলো না, বললো না তো, 'এবার তোমার পালা, এসো।' ওদের তৃতীয় পালা চলছে এবার, আর সে কেঁদেই চলেছে, ছোট্ট মনের সব দুঃখ ব্যথা জল হয়ে দু'চোখ দিয়ে ঝরছে কেবল। এমন সময় হঠাৎ ভাস্কা বেড়ার ওদিক থেকে দেখা দিল। ডোরাকাটা বড় ট্রাউজার আর লম্বা শার্ট পরা, আঁটসাঁট করে কোমরে বেল্ট বাঁধা, টুপি মাথায় ভাস্কাকে বেশ চটপটে দেখাচ্ছে। এদিকে এক পলক তাকিয়েই ও ব্যাপারটা যেন এক মুহূর্তে বুঝে নিল। তারপর চীৎকার করে উঠলো, 'এই, কি করছো তোমরা? এটা তোমাদের সাইকেল নাকি, না, ওর? শেরিওঝা, এদিকে এসো তো' .... ভাস্কা বেড়া ডিঙ্গিয়ে এদিকটায় এসে ওদের হাত থেকে সাইকেলটা তক্ষুণি ছিনিয়ে নিয়ে নিল। ঝেঙ্কা, লিডা আর শুরিক কথাটি না বলে একপাশে সরে দাঁড়ালো। শেরিওঝা দু'হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে এদিকে এগিয়ে এলো এবার।

লিডা গোমড়া মুখে বললো, 'তোমরা দু'টিতেই বড় ছোটলোক!'

ভাস্কা ধমকে উঠলো, 'আর তোমরা? স্বার্থপর, পাজি, অসভ্য......' আরও কি গালাগালি দিয়ে শেষে বললো, 'সবার

ছোট যে তাকেই আগে শিখতে দিতে হয় তাও জান না বুঝি ? এসো, শেরিওঝা, এসো তো'.........

শেরিওঝা এবার সাইকেলটায় চড়ে বসলো। লিডা ছাড়া আর সবাই ওকে শিখতে সাহায্য করলো। লিডা ঘাসের ওপর লেপটে বসে একমনে ঘাসফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মালা গাঁথতে লাগলো যেন ঐ সাইকেল চড়ার থেকে এতেই তবু আনন্দ বেশী। তারপর কিছুক্ষণ পর ভাস্কা বললো, 'এখন
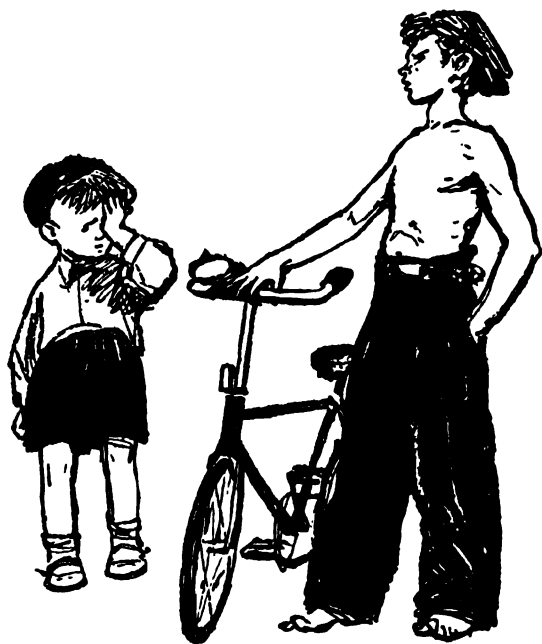
আমি চড়বো, কেমন।' শেরিওঝা খুশীমনেই ওকে সাইকেলটা ছেড়ে দিল। ভাস্কার জন্য সে এখন সব কিছু ছাড়তে পারে।

তারপর আবার সে চড়লো। এখন সে একা একা চড়তে বেশ শিখে গেছে। মাটিতে না পড়ে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরলো। এদিক ওদিক হেলে ছুলে পড়ি পড়ি করে শেষ পর্যন্ত না পড়ে সে খানিকটা চড়তে শিখলো। ওর পা চাকার মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় চারটে স্পোক খুলে এলো। কিন্তু হলে কি হবে, সাইকেলটা এত চমৎকার যে তবুও সেটা ঠিকই চলছে। এবার অন্য ছেলেদের জন্য শেরিওঝার কষ্ট হোল। 'ওরাও চড়ুক, আমি আবার না হয় চড়বো,' বলে সে ওদের হাতে সাইকেলটা দিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ পর মাসী বাগানে কি কাজে এসে কান্নার শব্দ শুনতে পেয়ে তাকিয়ে দেখে শেরিওঝা ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। একটু এগিয়ে এসে দেখে একটা বিচিত্র শোভাযাত্রা এদিকেই এগিয়ে আসছে। প্রথমে শেরিওঝা হাতল দু'টি হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আসছে। তারপর ভাস্কা সাইকেলের কাঠামোটা হাতে নিয়ে, তার পিছনে ঝেঙ্কার দু' কাঁধে দু'টো চাকা ঝুলছে। লিডার হাতে ঘন্টিটা আর শুরিক সবার শেষে এক বাণ্ডিল স্পোক হাতে নিয়ে চলেছে।

মাসী রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলো, 'কী সর্বনাশ! নূতন সাইকেলটা'......

শুরিক বলে উঠলো, 'আমরা কিছু করিনি কিন্তু। ও নিজেই এই কাণ্ডটা করেছে। চাকার মধ্যে ওর পা ঢুকে গিয়েছিল কিনা।'

কোরোসটিলেভ এতক্ষণে বাইরে এসে দেখতে লাগলো,

ব্যাপারটা কি। তারপর একটু হেসে বললো, 'বাঃ! জিনিসটাকে বেশ সদ্ব্যবহার করেছে তো!'

শেরিওঝা এবার চীৎকার করে কেঁদে উঠলো।

কোরোসটিলেভ ওর কাছে এসে গায়ে হাত বুলিয়ে বললো, 'না, আর কাঁদে না! ওটা সারিয়ে আনবো দেখো। কারখানায় নিয়ে গেলেই ওরা আবার ওটাকে একেবারে নূতন করে দেবে।'

কিন্তু শেরিওঝা মাথা নীচু করে মাসীর ঘরে ঢুকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই লাগলো। কোরোসটিলেভ ওকথা শুধু তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বলেছে। ভাঙ্গা টুকরোগুলোকে জোড়া লাগিয়ে দিলেই আবার কি ওটা আগের মত সুন্দর চকচকে সাইকেল হবে? কেউ ওটাকে সারাতে পারবে না। সেকি তা বোঝে না? তাকে শুধু শুধু ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে কেন? আবার নরম গদিতে বসে ঘন্টি বাজিয়ে ওটাকে আর সে চালাতে পারবে না কোনদিন। সোনালী রোদ ওটার চাকার ঝকঝকে স্পোকগুলোর গায়ে পড়ে আবার ঝিকমিক করে উঠবে কোনদিন? অসম্ভব! একেবারেই গিয়েছে ওটা।

সারাটা দিন শেরিওঝা কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে গোমড়া হয়ে রইলো। কোরোসটিলেভ ওরই জন্য গ্রামোফোনটা বাজাতে আরম্ভ করলেও সে তাতে একটুও আনন্দ পেল না, একটুও হাসলো না। কত মজার মজার হাসির গান পাড়ার সবাই একমনে শুনলো। কিন্তু তার কিছুই ভাল লাগছে না। নিজের দুঃখের ভাবনা ভাবতে ভাবতে সে সারাটা দিন মনমরা

হয়ে রইল। সত্যি, জীবনটা কী বিশ্রী মনে হচ্ছে, কোথাও এতটুকু আনন্দ বা হাসি, কিছু নেই যেন।

কিন্তু তারপর কি হ'ল বল দেখি? ওটাকে কয়েক দিনের মধ্যেই সারিয়ে আনা হোল। কোরোসটিলেভ তাহলে বাড়িয়ে বলেনি! সে ওটাকে 'ব্রাইট শোর' ফার্মে নিয়ে গিয়ে মিস্ত্রি দিয়ে সুন্দর করে সারিয়ে নিয়ে এলো। মিস্ত্রি বলে দিল বড়রা যেন আর না চড়ে, তাহলে কিন্তু আবার সেই কাণ্ড হবে! আর ঝেঙ্কাও একথা শুনল, তারপর থেকে শুধু শেরিওঝা আর শুরিক মজা করে চড়তে লাগলো। বড়রা কেউ ধারে কাছে না থাকলে লিডাও কখনও কখনও চড়ে বসতো। তা, লিডা তো রোগা আর হালকা, তাই ও চড়লে ক্ষতি কিছু হবে না ভেবে শেরিওঝা ওকে খুশীমনেই চড়তে দেয়।

কিছুদিনের মধ্যেই শেরিওঝা সাইকেল চালানোয় পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠলো। দু'হাত বুকে গুটিয়েও ঢালু রাস্তায় সে বেশ চালাতে পারতো। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই প্রথম দিনটির মত যেন আর সেই রোমাঞ্চকর মজা নেই এতে!

তারপর একদিন সাইকেল চড়তে আর ভাল লাগলো না। রান্নাঘরের এককোণে লাল আলো আর রূপোর মত ঝকঝকে ঘন্টিটা বুকে নিয়ে মজবুত সুন্দর সাইকেলটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো দিনের পর দিন। শেরিওঝা পায়ে হেঁটেই এদিক ওদিক ঘোরা-ফেরা সুরু করলো আবার। সাইকেলটার কথা যেন সে ভুলেই যেতে লাগলো। আর ওটাকে আগের মত ভাল লাগে না। তাই অবহেলায় ওটা ঘরের এককোণেই পড়ে থাকলো।

কোরোসটিলেভ আর অন্যরা

বড়রা কিন্তু মাঝে মাঝে বড় আজেবাজে কথা বলে! এই ধরোনা, শেরিওঝা একদিন ওর চায়ের কাপ উল্টে ফেললো, আর যায় কোথা, মাসী বকবকানি স্থুরু করলো, 'কী তড়বড়ে ছেলে বাব্বা'! তোমার জন্য ধোয়া-কাচা করতে করতে মরলাম বাপু। এখনও কি ছোটটি আছ নাকি?'

শেরিওঝার মতে এসব কথা একেবারেই নিরর্থক আর অকারণ। এসব কথা সে হাজার বার শুনেছে, আর কত শুনতে ভাল লাগে বল? তাছাড়া, চায়ের কাপ উল্টে ফেলেই সে বুঝতে পেরেছে কাজটা মোটেই ভাল হয়নি আর সেজন্য তক্ষুণি মনে মনে দুঃখিতও হয়েছে। লজ্জিত হয়ে কেবল ভাবছে অন্যরা দেখবার আগেই মাসী টেবিল-ক্লথটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলছে না কেন? কিন্তু মাসী বক্‌বক করেই চলেছে।

'তুমি একবার ভেবেও দেখ না যে, টেবিল-ক্লথটা কেউ কষ্ট করে কাচে, ধোয়, ইস্ত্রি করে আর এসব কাজে কী কষ্টই না করতে হয়'...

'আমি ইচ্ছে করে ফেলিনি। কাপড়টা কেমন পিছলে পড়ে গেল যে!' শেরিওঝা একবার বলে ফেললো।

মাসী তার কথায় কান না দিয়ে বলতেই থাকে, 'জান, টেবিল-ক্লথটা পুরানো হয়ে গেছে। রিফুর ওপরে রিফু করছি ওটাকে। একদিন সারা দুপুর বসে রিফু করেছি।'

যেন নূতন টেবিল-ক্লথের ওপরেই কাপ উল্টে ফেললে ভাল

হোত, এমনই সব অদ্ভুত কথাবার্তা ওদের ! একটু চুপ করে থেকে মাসী আবার বলছে, 'ইচ্ছে করে ফেলনি বলেই ত মনে হচ্ছে। ইচ্ছে করে ফেললে মজাটা টের পেতে।'

হাঁ, শেরিওঝা যদি কোন বাসনপত্তর কখনও ভেঙ্গে ফেলে তাহলে ঠিক এমনই বাজে কথা হাজার বার শুনতে হয় ওকে। ওরা নিজেরা গ্লাস বা প্লেট ভাঙ্গলে কোন দোষ নেই, কিন্তু সে ভাঙ্গলেই যত দোষ !

আর মায়ের কথাগুলো তো কী অদ্ভুত ! কোন কথা বলতে গেলেই মা তাকে কথার আগে 'প্লিজ' অর্থাৎ 'দয়া করে' কথাটা বলতে বলে। এই শব্দটার কোন অর্থ আছে নাকি ? মা বলবে, 'এ কথাটার অর্থ তুমি ভদ্রভাবে কিছু চাইছো। আমার কাছে যদি একটা পেন্সিল চাও তাহলে তোমাকে 'প্লিজ' কথাটা বলতেই হবে। ওটা বললে বুঝবো তুমি আমাকে অনুরোধ করছো আর এটাই সত্যিকারের ভদ্রতা, বুঝলে ?'

'কিন্তু আমি যদি শুধু পেন্সিলটা চাই, তাহলে কি তুমি বুঝতে পারবে না ?' শেরিওঝা অবাক হয়ে হয়তো প্রশ্ন করলো এবার।

'আমাকে একটা পেন্সিল দাও, শুধু একথা বলতে নেই। লোকে তাহলে অসভ্য বলবে। দয়া করে আমায় একটা পেন্সিল দাও—দেখ তো কথাটা কত মিষ্টি আর সুন্দর শোনাচ্ছে। আর এমন করে বললে আমিও খুশী হয়ে তোমাকে পেন্সিলটা দেব, বুঝলে ?'

'আর আমি যদি ওকথাটা না বলি তাহলে কি পেন্সিলটা দিতে তোমার কষ্ট হবে?'

'দেবই না পেন্সিলটা।'

আচ্ছা, তাহলে এখন থেকে ও মায়ের কথামতই না হয় সব কথার আগে অদ্ভুত অনর্থক ঐ কথাটা বসাবে। ওর মা চায়, তাই হোক তাহলে। ওদের ধারণাগুলো বড্ড অদ্ভুত কিন্তু। ওরা বড়, তাই বাচ্চাদের ওরা শাসন করবেই চিরকাল! পেন্সিল দেওয়া না দেওয়া ওদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে; তাই বড়দের খেয়াল-খুশিমত ওকে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও চলতে হবে।

কিন্তু কোরোসটিলেভের কথা আলাদা; সে এসব ছোট খাট ব্যাপারে একটুও মাথা ঘামায় না! শেরিওঝা 'প্লিজ' বললো কি বললো না এসব ব্যাপার নিয়ে ও কোনদিন একটি কথাও বলে নি তাকে। বারান্দার এক কোণে বসে সে যখন একমনে খেলা করে কোরোসটিলেভ তখন কখনও তাকে বিরক্ত করবে না বা অন্যদের মত, 'এদিকে এসে আমায় একটা চুমু দাও তো লক্ষ্মীছেলে', এমন বোকা কথাটিও বলবে না। কিন্তু লুকিয়ানিচ কাজ থেকে ফিরে এসেই ওকে একথাটা বলবেই বলবে তা সে তখন খেলা করুক আর নাই করুক। তারপর তার খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি ওর নরম গালে ঘষে দিয়ে ওকে জোর করে চুমু খাবে, আর হয়তো একটা চকোলেট বা আপেল দেবে। এটা অবশ্য খুবই ভাল কিন্তু একমনে খেলা করবার সময় এভাবে গোলমাল করাটা কিন্তু ওর একদম পছন্দ হয়

না। আপেল তো সে অন্য সময়েও খেতে পারে, একথাটা কোরোসটিলেভের মত অন্যরাও বোঝে না কেন?......

কোরোসটিলেভের কাছে সারাদিন কত রকম লোক আসছে, যাচ্ছে। তোলিয়া কাকু তো প্রায় রোজই আসে। কাকু দেখতে ভারী সুন্দর, বয়সও কত অল্প, লম্বা লম্বা চোখের পাতাগুলো কী কালো কুচকুচে। দাঁতগুলো সাদা ধবধবে আর হাসিটা কী মিষ্টি! শেরিওঝা ওর দিকে অবাক বিস্ময়ে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, কারণ কাকু নাকি আবার কবিতাও লিখতে পারে? ওকে কবিতা আবৃত্তি করতে বললেই প্রথমে লজ্জিতভাবে মাথা নাড়বে, একটু পরেই এক পাশে দাঁড়িয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে সুরু করবে। সব রকম কবিতাই ও লিখতে পারে,—যুদ্ধ, শান্তি, যৌথ খামার, নাৎসি, বসন্তকাল—রকমারি সমস্ত বিষয় নিয়েই ও কবিতা লেখে। নীল নয়না অপূর্ব রূপসী কোন মেয়ের কথাও ও কবিতায় লেখে যার জন্য ও নাকি আজীবন ধরে প্রতীক্ষা করছে আর পাতার পর পাতা কবিতা লিখে চলেছে।

কিন্তু কই, তবুতো সেই মেয়েটির আজ অবধি দেখা নেই! কিন্তু কবিতাগুলো সত্যই কী সুন্দর আর অপূর্ব! ঠিক যেন বইয়ের কবিতার মতই সুরেলা আর মধুর। কবিতা আবৃত্তি করবার আগে তোলিয়া কাকু তার কালো ঝাঁকড়া চুলের গুচ্ছ কপাল থেকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে একটুখানি কেশে নিয়ে ছাদের কানিশের দিকে চোখ তুলে গম্ভীর সুরে কবিতা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করবে। সবাই ওকে এই

আবৃত্তির জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা করবে আর মা ওকে সুন্দর করে এক কাপ চা তৈরী করে দেবে। তারপর সবাই মিলে চা খেতে খেতে অসুস্থ গরুর কথা আলোচনা করবে হয়তো, 'ব্রাইট শোর' ফার্মের গরুগুলোর অসুখ করলে তোলিয়া কাকুই তাদের চিকিৎসা করে আবার সুস্থ সবল করে তোলে কিনা।

কিন্তু সবাই তো আর কাকুর মত সুন্দর আর ভাল নয়। যেমন ধরো না, পিওত্‌র্‌ কাকার কথা। শেরিওঝা তো সব সময় তাকে এড়িয়েই চলতে চায়। লোকটা দেখতে কী বিশ্রী আর মাথাটা তো একটা সেলুলয়েডের চকচকে বলের মত, একদম ন্যাড়া। হাসবেও কী বিশ্রী ভাবে, হি-হি-হি-হি। একদিন সে মায়ের পাশে বারান্দায় বসে আছে, কোরোসটিলেভ কোথায় বেরিয়েছে, এমন সময় পিওত্‌র্‌ কাকা এসে তাকে ডেকে সুন্দর কাগজে মোড়ানো একটা বড়সড় চকোলেট হাতে দিল। শেরিওঝা ভদ্রভাবে 'ধন্যবাদ' বলে মোড়কটা খুলে দেখে ভেতরে চকোলেট টকোলেট কিছুই নেই। পিওত্‌র্‌ কাকা এভাবে তাকে ঠকালো আর নিজেও এত আশা করে ঠকলো বলে সে লজ্জায় অপমানে দুঃখে এতটুকু হয়ে গেল। মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে মাও যেন লজ্জা পেয়েছে। পিওত্‌র্‌ কাকা কুৎসিতভাবে হাসছে, 'হি-হি-হি······'

এবার শেরিওঝা একটুও না রেগে গভীরভাবে নিরুত্তাপ স্বরে বলে বসলো, 'পিওত্‌র্‌ কাকা, তুমি কি বোকা।'

মাও নিশ্চয় তাই ভেবেছে, কিন্তু মা তক্ষুণি চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি বললে? এক্ষুণি ক্ষমা চাও কাকার কাছে।'

শেরিওঝা মায়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। মা আবার বললো, 'শুনতে পাচ্ছ না কি বলছি?' এবারও সে কোন উত্তর দিল না। মা তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। তারপর বললো, 'আমার কাছে আর আসবে না তুমি, বুঝলে? এমন অবাধ্য দুষ্টু ছেলের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।' তারপরেও মা খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো যদি সে ক্ষমা চায় এই আশায় হয়তো। কিন্তু ঠোঁট চেপে অনেক কষ্টে কান্না রোধ করে সে কালো মুখ করে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো শুধু। সে কোন অন্যায় করেছে বলে ভাবতে পারছে না। তাহলে কেন ক্ষমা চাইতে যাবে? যা সত্যি ভেবেছে সে তাই তো বলেছে শুধু।

মা এবার চলে গেল। এক পা দু' পা করে সে মাসীর ঘরে গিয়ে খেলনাগুলো আনমনে নাড়াচাড়া করতে করতে ব্যাপারটা ভুলে থাকবার চেষ্টা করলো। তার ছোট্ট হাত দু'খানির আঙ্গুলগুলো অভিমানে আর রাগে কাঁপছে থর থর করে। পুরানো তাস থেকে কাটা ছবিগুলো উদাস মনে নাড়তে নাড়তে সে হঠাৎ ইস্কাবনের কালো বিবিটার মাথা পটাস্ করে ছিঁড়ে ফেললো।...... মা কেন ঐ পাজি পিওত্‌র্ কাকাটার পক্ষ টেনে কথা বলে? ঐ তো মা এখনও ওরই সঙ্গে কথা বলছে, হাসছেও। কিন্তু শুধু শুধু তার সঙ্গেই আড়ি দিয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলায় সে শুনতে পেল মা কোরোসটিল্লেভকে সমস্ত ঘটনা বলছে।

কোরোসটিলেভ বলছে, 'ও ঠিকই করেছে। একেই আমি সত্যিকারের সমালোচনা বলবো!'

মা আপত্তির সুরে বললো, 'কিন্তু তা বলে একটা বাচ্চা গুরুজনদের সমালোচনা করবে? তাহলে ওদের শিক্ষা দেব কি করে? ছোটরা সম্মান দেখাবে না?'

'কিন্তু ঐ গাধাটাকে ও কিসের জন্য সম্মান দেখাবে বল তো?'

'নিশ্চয়ই দেখাবে। বড়রা বোকা বা গাধা এ কথাটাই ওর মনে হওয়া উচিত হয় নি, বুঝলে? পিওত্‌রের মত বড় হলে তবে বড়দের সমালোচনা করতে পারবে। তা বলে এখনই এ বয়সে এসব ডেঁপোমি চলে না।'

'আমার মতে যদি সাধারণ বিচার বুদ্ধি বিবেচনার কথা বল, তাহলে কিন্তু আমাদের শেরিওঝা এখনই পিওত্‌রের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। আমার তো তাই ধারণা। আর তাছাড়া শিক্ষাদানের এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম রীতি নেই যার জন্য সত্যিকারের গাধাকে কোন ছোট্ট ছেলে গাধা বলে ভাবতে পারবে না, আর তা ভাবলেই তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।'

ওদের সব কথা শেরিওঝা ঠিক বুঝতে না পারলেও একথাটা ঠিকই বুঝলো যে পিওত্‌র্ কাকাকে গাধা বলায় কোরোসটিলেভ বেশ খুশীই হয়েছে। সত্যি, কোরোসটিলেভের কাছে সে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে।

সত্যিকথা বলতে কি, কোরোসটিলেভ অন্য সকলের

চাইতে কত আলাদা। এতদিন সে ওদের সঙ্গে না থেকে দিদিমা আর বড় দিদিমার সঙ্গে থাকতো আর মাঝে মাঝে ওদের এখানে শুধু বেড়াতে আসতো একথা যেন আজ আর ভাবাই যায় না।

শেরিওঝাকে সে পুকুরে স্নান করতে নিয়ে যায়, সাঁতার শেখায়। মা তো ভয়েই অস্থির, শেরিওঝা বুঝি ডুবেই যাবে। কিন্তু কোরোসটিলেভ মায়ের কথায় কান না দিয়ে শুধু হাসে। শেরিওঝার খাটের দু'ধারের কার্নিশ উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কোরোসটিলেভই করলো। মা আপত্তি তুলে বললো, সে নাকি তাহলে রাত্রিতে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ে যাবে আর ব্যথা পাবে। কিন্তু কোরোসটিলেভ দৃঢ় স্বরে বললো, 'ধর আমরা ট্রেনে কোথাও অনেক দূরে যাচ্ছি। তখন সে ওপরের বার্থে শুলো। তাহলে? বড়দের মত শুতে অভ্যাস করতে হবে না বুঝি?'

তাই এখন আর সকাল বিকাল ওকে খাটের কার্নিশ বেয়ে বেয়ে বিছানায় যেতে আসতে হয় না। বড়দের মতই খোলা বিছানায় মজা করে ঘুমায়। একবার অবশ্য সে নাকি রাত্রিবেলা বিছানা থেকে ধুপ করে মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল। পাশের ঘর থেকে শব্দ শুনতে পেয়ে ওরা তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে বিছানায় শুয়ে দেয়। সকাল বেলা সেকথা বললে সে অবাক হয়ে ভাবলো, ওর তো কই কিছুই মনে পড়ছে না! শরীরের কোথাও এতটু ব্যথাও লাগেনি। তাহলে আর এমনি করে কার্নিশ-ছাড়া খাটে শোয়ার কি আপত্তি থাকতে পারে?

একদিন উঠানে সে একটা আছাড় খেল। হাঁটুর চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে অনেকটা রক্তও ঝরলো। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরলে মাসী ব্যাণ্ডেজের জন্য ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো। কিন্তু কোরোসটিলেভ বললো, 'কেঁদো না সোনা। ছিঃ, কাঁদতে নেই। এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে। ধরো তুমি একজন সৈন্য, যুদ্ধে আহত হয়েছো। কি করবে তখন, কাঁদবে?'

শেরিওঝা কান্না ভুলে প্রশ্ন করলো, 'তুমি আঘাত পেলে কাঁদতে না?'

'না। কেমন করে কাঁদবো বল? অন্য ছেলেরা তাহলে বেজায় ক্ষেপাবে যে! আমরা পুরুষেরা বীর সৈনিকের জাত, এরকম তো হবেই হামেশা। এটাই তো নিয়ম।'

শেরিওঝা এবার চোখের জল মুছে ফেললো। ওদের মত সেও বীরপুরুষ একথা প্রমাণ করবার জন্য হা-হা হাসতে চেষ্টা করলো। মাসী ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এলে চোখের জল মুছে হাসি নিয়ে বললো, 'দাও, বেঁধে দাও। একটুও ব্যথা লাগছে না কিন্তু।' তারপর কোরোসটিলেভ ওকে যুদ্ধের গল্প বলতে লাগলো। যুদ্ধের কত বীরত্ব কাহিনী শুনে কোরোসটিলেভের পাশে এক টেবিলে বসে বিচিত্র এক গর্বে তার বুকখানি ভরে উঠলো। আবার যদি সুরু হয় তাহলে যুদ্ধে কে যাবে? কেন, সে আর কোরোসটিলেভ তো যাবেই! যুদ্ধ ওদের জীবনের প্রধান একটা অঙ্গ। মা, মাসী আর লুকিয়ানিচ এখানেই থাকবে, ওদের জন্য অপেক্ষা করবে শুধু। ওরা তো আর যুদ্ধে যাবে

না, কারণ এখানে বসে থাকাই ওদের জীবনের ধারা। ওরা দু'জনে কেবল যুদ্ধে যাবে।

যার যা কাজ, তাই হাসি মুখে করতে হবে বৈকি।

ঝেঙ্কা

ঝেঙ্কার মা বাবা কেউ নেই। ও ওর মাসীর কাছে থাকে। মাসীর এক মেয়ে। সে মেয়েটি দিনের বেলায় কোথায় কি কাজে যায় আর সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে কেবল নিজের পোশাক ইস্ত্রি করে। উঠোনের এক কোণে একটা গন্‌গনে উনুনের ওপর ইস্ত্রিটা চাপিয়ে সারাটা সন্ধ্যেবেলা কেবল ইস্ত্রি করবে তারপর পরিপাটি করে সেজেগুজে ক্লাবে নাচতে চলে যাবে। পরদিন সন্ধ্যেবেলায় আবার সেই ইস্ত্রি নিয়ে মাতবে।

ঝেঙ্কার মাসীও কোথায় কাজ করে। সে কলতলায় দাঁড়িয়ে প্রতিবেশিনীদের শুনিয়ে অভিযোগের সুরে কেবলই বলবে ধোয়ামোছা আর চিঠিপত্র পাঠানো দুটো কাজ করে কিন্তু বেতন পায় একজনের। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে সকলকে শোনাবে, অভিযোগের খাতায় সে যা লিখে দিয়েছে তাতে ম্যানেজার কি রকম জব্দ হয়েছে।

মাসী সর্বদাই ঝেঙ্কার ওপর রেগে আছে। ও নাকি কেবল একগাদা খেতেই জানে, বাড়ির কোন কাজের বেলায় একেবারে অকর্মা। ঝেঙ্কার সত্যি কিন্তু কোন কাজ করতে ভাল লাগে না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই যা খাবার থাকে তা খেয়ে রাস্তার অন্য ছেলের সঙ্গে খেলতে চলে যায়।

তারপর সারাটা দিন রাস্তায় রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে বা পাড়াপড়শীদের সঙ্গে খেলে গল্প গুজব করে কেমন দিব্যি কাটিয়ে দেয়।

শেরিওঝাদের বাড়িতে এলে মাসী ওকে সর্বদাই একটা না একটা কিছু খেতে দেবে। ওর মাসী কাজ থেকে ফিরবার একটু আগে ঝেঙ্কা বাড়ি ফিরে ওর পড়া নিয়ে বসবে। ক্লাসে ও অনেক পিছনে পড়ে আছে বলে ছুটির পড়া অনেক জমে গেছে।

প্রতি বছর প্রতিটি ক্লাসে ও ফেল করছে। ভাস্কা ওর অনেক নিচু ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু এখন ভাস্কা আর ও একসঙ্গে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে যদিও ভাস্কাও একবার ফেল করেছে। ঝেঙ্কার চাইতে ভাস্কা দেখতে এখন অনেক বড়সড় হয়ে গেছে, শরীরের শক্তিও অনেক বেশী ওর।

মাস্টার মশায়রা প্রথম প্রথম ঝেঙ্কার জন্য চিন্তিত, ব্যস্ত হয়ে ওর মাসীর কাছে যেতো বা তাকে ডেকে পাঠাতো।

মাসী তাদের বলে, 'আমার যেমন পোড়া বরাত,. তাই ঐ লক্ষ্মীছাড়া ছেলে আমার কাঁধে চেপেছে। ওকে নিয়ে আপনারা যা খুশি করুন, আমাকে কিছু বলবেন না। আমাকে ওটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে বিশ্বাস করুন।' মাসী পড়শীদের কাছেও অভিযোগ করে বলবে, 'মাস্টাররা বলে ওকে নিরিবিলি পড়বার জন্য একটু বিশেষ ব্যবস্থা করে দিই না কেন। কিন্তু ওর তো সে ব্যবস্থার কোন দরকার নেই। ওর দরকার হোল আচ্ছা করে চাবুক খাওয়া। কিন্তু কি করবো,

মরা বোনের ছেলে বলে তাও পারি না যে!' মাস্টার মশায়রা তারপর থেকে মাসীর কাছে আসা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু তারা সবাই ঝেঙ্কাকে খুব প্রশংসা করে কারণ ও নাকি খুব শান্ত আর নিরীহ। অন্য ছেলেরা ক্লাসে কেবল বক্‌বক্ করে, কিন্তু ঝেঙ্কা চুপটি করে বসে থাকে। শুধু পড়াটা বলতে পারে না একদম আর প্রায়ই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে, এই যা দোষ। সুন্দর মিষ্টি স্বভাবের জন্য প্রতিবার ও সবার চেয়ে বেশি নম্বর পায়, গানের জন্যও পুরস্কার পায়। কিন্তু অন্য সমস্ত বিষয়ে একেবারে যতদূর সম্ভব কম নম্বর পায়। মাসীর সামনে ঝেঙ্কা পড়বার বা লিখবার ভান করে বলে মাসী কিছু বলতেও পারে না। বাড়ি ফিরে মাসী ঠিকই দেখবে ঝেঙ্কা রান্নাঘরের টেবিলে ময়লা বাসনপত্তর পাঁজা করে এককোণে সরিয়ে রেখে খাতা পেন্সিল নিয়ে একমনে অঙ্ক কষছে। মাসীই প্রথম কথা বলবে, 'কুঁড়ের বাদশা, খুব তো লেখাপড়া হচ্ছে দেখছি! কিন্তু জল আনবে কে? কেরোসিন তেলটাও তো দেখি আন নি! আঃ! একটা কাজও যদি তোমাকে দিয়ে হয়! এমন অকর্মার ধাড়ি ছেলেকে আর কতদিন এমনি বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবো আমি?'

ঝেঙ্কা হয়তো বললো, 'আমি তো অঙ্ক কষছিলাম।'

মাসী তেমনি রুক্ষ মেজাজে বকে চললো, ঝেঙ্কা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোতল হাতে নিল তেল আনতে যাবে বলে।

মাসী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে ধমকে উঠলো, 'ইয়ার্কি

পেয়েছ, না ? এখন দোকান বন্ধ হয়ে গেছে জান না ন্যাকা ছেলে ?'

'তাহলে কি করবো বল ? চেঁচাচ্ছ কেন ?' ঝেঙ্কা ক্ষীণ-স্বরে বললো।

বাজখাঁই গলায় ভীষণ চেঁচিয়ে উঠে মাসী এবার বললো, 'যাও, কাঠ কেটে আনগে। এক্ষুণি আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যাও হতচ্ছাড়া ছেলে! কাঠ না নিয়ে বাড়িতে একবার ঢুকেই দেখ না!' তারপর এক ঝটকায় বালতিটা টেনে নিয়ে তেমনই চীৎকার করতে করতে মাসী জল তুলতে চলে গেল আর ঝেঙ্কা ধীরে সুস্থে কাঠ কাটতে গুদামের দিকে চললো।

মাসী যে ওকে অলস, অকর্মা বলে, এটা কিন্তু একেবারেই সত্যি নয়। পাশা মাসী বা ছেলেরা কেউ ওকে যে কোন কাজ করতে বললে ও হাসিমুখে তক্ষুণি তা করে দেয়। আর একটু প্রশংসা করলে, ভালবেসে দু'টো মিষ্টিকথা বললে তো আর কথাই নেই। প্রাণপণ করে তার কাজ করে দেবার চেষ্টা করবে ও।

একবার ও আর ভাস্কা একগাদা কাঠ কেটেছিল, প্রায় বলতে গেলে বনের অর্ধেকটাই কেটে এনেছিল। সবাই যে ওকে বোকা বলে তাও ও নয় কিন্তু।

শেরিওঝার মেকানো-সেট্‌টা নিয়ে ঝেঙ্কা আর শুরিক একবার এমন সুন্দর নিখুঁত একটি রেলওয়ে সিগন্যাল তৈরী করেছিল যে অনেক দূর দূর থেকেও ছেলের দল সেটা দেখতে

এসেছিল। সিগন্যালটায় একটা লাল আর সবুজ আলো জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ওটা তৈরী করতে শুরিক অবশ্য অনেক সাহায্য করেছে। শুরিক কলকব্জার কাজ আবার বেশ ভালই বোঝে আর জানে। কারণ ওর বাবা তিমোখিন লরী চালায় কিনা। কিন্তু শেরিওঝার নববর্ষের সাজানো গাছ-খেলনা থেকে ঐ লাল আর সবুজ আলো সিগন্যালটায় জুড়ে দেবার কথা ঝেঙ্কাই মনে করিয়ে দিয়েছিল। শেরিওঝার প্লাস্টাসিন দিয়ে ও কতবার ছোট ছোট পশু, পাখি ও মানুষ তৈরী করেছে।

শেরিওঝার মা তা দেখে তাকেও ওরকম একবাক্স প্লাস্টাসিন কিনে দিয়েছে। কিন্তু ঝেঙ্কার মাসী দেখে রেগে আগুন। বাক্সভরা প্লাস্টাসিন সে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ভাস্কার কাছ থেকে ঝেঙ্কা কিন্তু সিগারেট খাবার বদ অভ্যাসটি আয়ত্ত করেছে। ওর তো আর পয়সা নেই, তাই ভাস্কার কাছ থেকেই খায়, রাস্তার ওপর বিড়ি বা সিগারেটের টুকরো পড়ে থাকতে দেখলেই ও তা কুড়িয়ে নিয়ে টানতে স্থুরু করবে।

শেরিওঝাও ওর কষ্ট বুঝতে পারে, তাই রাস্তা থেকে বিড়ি বা সিগারেটের টুকরো তুলে এনে প্রায়ই ওকে দেয়।

ভাস্কার মত ঝেঙ্কা অবশ্য ছোটদের সঙ্গে কখনও মাতব্বরী করতে যায় না। সে যখন তখন ছোট ছেলেদের সঙ্গে ওরা যেমন চায় খেলা করতে ভালবাসে। সৈন্য সৈন্য খেলা বা লটো খেলা, যা হোক। ও সবার চেয়ে বয়সে বড় বলে সৈন্য সৈন্য

খেলায় সেনাপতি হতে চায়। আর লটো খেলায় জিতলে খুব খুশী কিন্তু হারলেই মুখ গোমড়া হয়ে যায়। ঝেঙ্কার মুখখানি দেখতে বেশ মিষ্টি, চোয়ালটা বেশ বড়, কান দু'টো লম্বা লম্বা আর চুলগুলো ঘাড় বেয়ে প্রায় কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। কারণ চুল তো বছরে কাটা হয় একবার কি দু'বার।

একদিন শেরিওঝাকে সঙ্গে নিয়ে ভাস্কা আর ঝেঙ্কা বনের মধ্যে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে আলু পুড়তে লেগে গেল। আলু,

নূন আর কচি পেঁয়াজ ওরা সঙ্গেই এনেছে। ধিকিয়ে ধিকিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে আগুন জ্বলছে।

ভাস্কা ঝেঙ্কাকে বললো, 'ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি কি হবে বল শুনি।'

ঝেঙ্কা হাঁটু গুটিয়ে বসে আছে। খাটো পায়জামা উঠে গিয়ে ওর সরু লিকলিকে পা দু'টো দেখা যাচ্ছে। ও উদাস অপলক দৃষ্টিতে আগুনের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে আছে নীরবে। ভাস্কাই আবার বললো, 'ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, স্কুলটা তো আগে শেষ করতে হবে, কি বল?'

'শিক্ষা না থাকলে জীবনটাই যে ব্যর্থ!' ভাস্কা বেশ ভারিক্কী চালে কথাটা বললো যেন পড়াশোনায় সে একেবারে প্রথম হয়ে ভাস্কার থেকে, ঝেঙ্কার থেকে গোটা পাঁচেক ক্লাস উপরে পড়ছে।

ঝেঙ্কা এবার মাথা নেড়ে বললো, 'তা সত্যি। পড়াশুনো না করলে কোন কাজেই লাগবো না আমি।' একটা কাঠি তুলে নিয়ে ও এবার আগুনটা খুঁচিয়ে দিল, ভিজে ডালপালা-গুলো ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে উঠলো · পাতার রস পড়ে আগুনটা খানিক ঝিমিয়ে গেলো। রকমারি গাছের মাঝখানটিতে একটু ফাঁকা জায়গায় ওরা বসে আছে। এ জায়গাটা ওদের কাছে খেলার আদর্শ জায়গা। বসন্তকালে এখানে কত বুনো ফুল ফোটে, ঝরে যায়। গরমকালে আবার বেজায় মশার দৌরাত্ম্য হয়। এখন ধোঁয়ার জন্য মশারা তেমন সুবিধা করতে পারছে না, তবে মশাদের মধ্যেও যারা বেশ সাহসী আর চালাক

তারাই মাঝে মাঝে ওদের হাতে পায়ে হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে সুযোগ মত। আর ওরা দু'হাতে মুখ-হাত-পা চাপড়াচ্ছে। ভাস্কা আবার গম্ভীর স্বরে বললো, 'তোমার মাসীটা বড় বাড়াবাড়ি করছে, একটু সমঝে দেওয়া যায় না ?'

'ওরে বাব্বা !' ঝেঙ্কা বলে উঠলো, 'একবার দিয়েই দেখ না !'

'তাকে একদম গ্রাহ্যই করবে না, বুঝলে ?'

'গ্রাহ্য আমি তেমন করি না। কিন্তু জান তো, মাসী সারাক্ষণই পেছনে লেগে আছে। তাই আর আমার ভালো লাগে না।'

'লিয়ুস্কা কি বলে ? ওর ব্যবহার কেমন ?'

'তা, ও তেমন দুর্ব্যবহার করে না। তাছাড়া ওর তো বিয়েই হয়ে যাচ্ছে।'

'কাকে বিয়ে করছে ?'

'কে জানে! যে কেউ হোক একজনকে করবেই। ওর নাকি অফিসার বিয়ে করবার সাধ হয়েছে। তা, এখানে আর অফিসার কোথায় আছে বল ? তাই হয়তো অফিসার বরের খোঁজে অন্য কোথাও যাবে।'

লক্‌লকে জিভ্ বের করে এতক্ষণে আগুনটা আরও এক আঁটি জ্বালানি আর একরাশ পাতা গিলে ফেললো যেন। এবার আর তেমন ধোঁয়া উঠছে না। পট্ করে কি যেন ফুটল, ধোঁয়া চলে গিয়েছে।

ভাস্কা শেরিওঝাকে বললো, 'কিছু শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে এসো তো।'

শেরিওঝা দৌড়ে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে দেখে ভাস্কা একমনে গম্ভীর চালে ঝেঙ্কার কথা শুনছে। ঝেঙ্কা তখন বলছে, 'আমি ওখানে রাজার হালে থাকবো, সন্ধ্যেবেলায় হোস্টেলে ফিরে দেখবো আমার জন্য পরিপাটি করে বিছানা তৈরী, বিছানার পাশে একটা আলমারী। আমি খুশিমত শুয়ে থাকবো, রেডিও শুনবো, তাস খেলবো, বকাবকি করার কেউ থাকবে না। খেলাধূলা চলবে। কী মজা! তারপর রাত্রিবেলা আটটার সময় খেতে দেবে …… ..'

'শুনতে তো বেশ ভালই লাগছে। কিন্তু তোমাকে নেবে তো?'

'আমি সেখানে দরখাস্ত পাঠাবো। কেন নেবে না? নিশ্চয়ই নেবে।'

'তোমার বয়স এখন কত হোল বল তো?

'গত সপ্তাহে চোদ্দ পূর্ণ হয়েছে।'.

'তোমার মাসীর কোন আপত্তি নেই তো?'

'না, মাসীর কিছুতেই আপত্তি নেই। কিন্তু শুধু ভয় যে আমি ভবিষ্যতে হয়তো তাকে কোন সাহায্যই করবো না।'

'মরুক গে তোমার মাসী। তার কথা কে আর ভাবছে?' ভাস্কা তার জোরালো ভাষায় আরও কি গালাগালি দিল।

ঝেঙ্কা বললো, 'ভাবছি আমি যেমন করে পারি যাবই ওখানে।'

'তোমার এখন কাজ হচ্ছে, কি করবে না করবে সে সম্বন্ধে মন স্থির করে ফেলা এবং যা করার করে ফেলা,' ভাস্কা বললো 'তুমি বলছো, তুমি ভাবছো। কিন্তু কিছুদিন যেতে

না যেতেই পড়াশুনার মরশুম সুরু হবে, আবারও যে-কে-সেই হয়ে দাঁড়াবে।'

ঝেঙ্কা বললো, 'হাঁ, মনে হয় মন স্থির করে যা করার করে ফেলবো। তুমি জানো ভাস্কা, প্রায়ই একথাটা আমি ভাবি। শীগগীরই যে সেপ্টেম্বর আসছে সে কথা মনে হলেই আতঙ্ক হয়, সমস্ত উৎসাহ দমে যায় একদম।'

ভাস্কা গম্ভীর মুখে বললো, 'কিছুই আশ্চর্য নয় তাতে।'

আলুগুলো সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ওরা ঝেঙ্কার পরিকল্পনা সম্বন্ধেই জল্পনা-কল্পনা করলো। তারপর আঙ্গুল পুড়িয়ে কচি পেঁয়াজের সরস গোড়াগুলো কড়মড় করে চিবিয়ে আলু সেদ্ধগুলো পরম তৃপ্তিভরে খেয়ে ওরা ওখানেই ঘুমিয়ে পড়লো। দুপুর গড়িয়ে বেলা শেষে সূয্যিমামা ঢলে পড়লো একপাশে, বনের ভিতর ফাঁকা এই সুন্দর জায়গাটুকু ক্রমে আঁধার হয়ে এলো। গাছের গোড়াগুলো পড়ন্ত সূর্যের আলোয় লালচে হয়ে এলো। ছাইচাপা আগুনের উপর বনের ছায়া এসে পড়ল। ওরা ঘুমোবার সময় শেরিওঝাকে মশা তাড়াবার জন্য ওদের গায়ে হাওয়া করতে বলেছিল। তাই সে বাধ্য ছেলের মত একটা পাতাওয়ালা ডাল হাতে নিয়ে ওদের গায়ের ওপর দোলাচ্ছে।

ডালটা দোলাতে দোলাতে ভাবছে, ঝেঙ্কা কোনদিন কাজ করলে ওর মাসীকে কি সত্যিই টাকা দেবে? কেন দেবে? ওর মাসীটা তো কেবল ওকে বকে আর ধমকায়। তবে? একটু পরেই এসব ভাবতে ভাবতে শেরিওঝা নিজেও ওদের

দু'জনের মাঝখানটিতে অকাতরে ঘুমে ঢলে পড়লো। তারপর সে স্বপ্ন দেখতে লাগলো—একদল অফিসারের সঙ্গে ঝেঙ্কার মাসতুতো বোন লিয়ুস্কা হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে ......

সাধারণতঃ ঝেঙ্কা শুধু ভাবে, ভাবনাকে কাজে পরিণত করতে চেষ্টা করে না কখনও। কিন্তু পয়লা সেপ্টেম্বর এগিয়ে আসছে, স্কুল খোলার তোড়জোড় সুরু হয়েছে আর ছেলে-মেয়েরা স্কুলে গিয়ে নূতন বইপত্র নিয়ে এলো। লিডা নূতন ইউনিফর্ম পরে গর্বিতভাবে সকলকে দেখাতে লাগল। নূতন বছর সুরু হয়ে এলো বলে।

এমনি সময়ে ঝেঙ্কা মন স্থির করে ফেললো। কোন স্কুল-বোর্ডিংয়ে অথবা কলকারখানার স্কুলে, যেখানে হোক ওকে যেতেই হবে।

অনেকেই ওকে এ ব্যাপারে সাহায্য করলো। ওকে নেবার জন্য তদ্বির করে স্কুল থেকে ওর দরখাস্ত পাঠানো হলো। কোরোসটিলেভ আর মা ওকে পথ খরচের জন্য কয়েকটি টাকা দিয়ে দিল। এমন কি ওর মাসীও পথে খাবার জন্য পিঠে তৈরী করে ওর সঙ্গে দিল। যাবার দিন সকালবেলা ওর মাসী একটুও চীৎকার না করে শান্তস্বরে ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো আর তাদের উপকারের কথা ভুলে না যেতে অনুরোধ করলো বারবার।

ঝেঙ্কাও বললো, 'হাঁ, মনে রাখবো। তুমি যা করেছ তার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মাসী।' মাসী কাজে চলে গেলে ঝেঙ্কাও যাবার জন্য তৈরী হতে লাগলো।

মাসী ওকে একটা সবুজ রঙের কাঠের নড়বড়ে বাক্স দিয়েছে। দেবে কি দেবে না তা ভাবতে ভাবতেও অনেক সময় গেছে। তারপর অবশ্য বাক্সটা দিয়ে বলেছে, 'আমার একখানি হাত যেন কেটে তোমায় দিয়ে দিলাম, বুঝলে তো?' সেই বাক্সটায় ঝেঙ্কা ওর কয়েকটা শার্ট, ছেঁড়াখোঁড়া এক জোড়া মোজা, নোংরা ছেঁড়া একটা তোয়ালে আর পিঠেগুলো ভরে নিল। অন্য ছেলেরা ওর বাঁধাছাদা দেখতে লাগলো।

শেরিওঝা এক দৌড়ে বাড়িতে চলে গেল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই রেলওয়ে সিগন্যালটা হাতে নিয়ে ফিরে এলো। এতদিন এটাকে টেবিলের ওপর অতিথি অভ্যাগতদের দেখাবার জন্যই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। আজ ওটা ঝেঙ্কার হাতে দিয়ে সে বললো, 'এটা নিয়ে যাও, তোমাকে দিলাম।'

ঝেঙ্কা বললো, 'এটাকে নিয়ে কি করবো আমি? কেমন করে নিয়ে যাব? এমনিতেই ত এক মণ মাল হয়েছে!'

শেরিওঝা আবার এক দৌড়ে গিয়ে একটা বাক্স হাতে ফিরে এলো। বললো, 'তাহলে এই বাক্সটাও নাও। এর মধ্যে ওটাকে ভরে নিতে পারবে। বেশ হালকা এটা!'

ঝেঙ্কা বাক্সটা নিয়ে খুলে দেখে খেলনা বানাবার জন্য প্লাস্টাসিনের কতগুলো টুকরোও রয়েছে তার মধ্যে। ঝেঙ্কার মুখখানি এবার খুশীতে ঝলমল করে উঠলো। বাক্সে গুছিয়ে নিল সেগুলো।

তিমোখিন ঝেঙ্কাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে বলেছিল।

গ্রামে এখনও রেল লাইন বসেনি, স্টেশনটা আবার বেশ খানিকটা দূরে। কিন্তু ঠিক সন্ধ্যের একটু আগে তিমোখিনের লরীটা কি জানি কেন বিগড়ে বসলো। শুরিক এসে বললো, লরীটাকে কারখানায় সারাতে দেওয়া হয়েছে আর ওর বাবা এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

ভাস্কা বললো, 'ভেবো না। কেউ না কেউ তোমাকে ঠিক তার গাড়িতে তুলে নেবেই।'

শেরিওঝা বললো, 'কেন, বাসেও তো যেতে পার।'

শুরিক বলে উঠলো, 'কী বোকা ছেলে, বাসে যেতে পয়সা লাগে না ? অত পয়সা ওর কোথায় ?'

ঝেঙ্কা বললো, 'আচ্ছা চল, বড় রাস্তায় যাওয়া যাক তো, কোন গাড়ি যেতে দেখলে হাত দেখিয়ে গাড়িটা থামালে আমাকে নিশ্চয়ই তুলে নেবে।'

ভাস্কা ওকে এক প্যাকেট সিগারেট দিল। ভাস্কার কাছে দেশলাই না থাকায় ঝেঙ্কা ওর মাসীর দেশলাইটাই নিয়ে নিল। তারপর ওরা সবাই বের হলো। ঝেঙ্কা বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা সিঁড়ির তলায় রেখে দিল। তারপর সবাই মিলে রওনা হলো। উঃ! বাক্সটা কী ভারি, একতাল সীসে যেন! ঝেঙ্কা একবার এক হাতে আরেকবার অন্য হাতে, এভাবে হাত বদলে বদলে বাক্সটা নিয়ে চললো। ভাস্কা ঝেঙ্কার কোটটা নিয়েছে। লিডা ছোট্ট ভিক্টরকে কোলে করে চলেছে। পেটের সঙ্গে জাপটে ধরে মাঝে মাঝে বাচ্চাটাকে ধমকাচ্ছে, 'আঃ! চুপ কর না দুষ্টু ছেলে।'

হু হু করে বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। শহর ছাড়িয়ে যে বড় রাস্তাটা স্টেশনের দিকে চলে গেছে ওরা তার ওপর দিয়ে চললো। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে ধুলো ওদের চোখের ভেতরে ঢুকতে লাগলো। রাস্তার হু'পাশে ধুলোয় ঢাকা ছাই রঙের ঘাস আর বিবর্ণ ফুলগুলো মাটিতে লুটিয়ে কাঁপছে কেবল। ওপরে নীল আকাশের বুকে সাদা সাদা হালকা মেঘের দল আপন মনে ভেসে বেড়াচ্ছে এদিক থেকে ওদিক। মাঝে মাঝে কালো হু'এক টুকরো মেঘ কোথা থেকে তেড়ে ফুঁসে আসছে যেন। বাতাস যেন ওদের বুক থেকেই শ্বাস হয়ে বের হচ্ছে। ছেলের দল রাস্তার একপাশে থমকে দাঁড়ালো, বাক্সটা নামিয়ে রেখে লরী বা গাড়ির অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু কী আশ্চর্য, আজ সমস্ত লরী আর গাড়িগুলোই যেন উল্টো দিকে যাচ্ছে। যাক্, শেষ পর্যন্ত ভারী বাক্স বোঝাই একটা লরী আসছে দেখা গেল। ড্রাইভারের পাশটিতে কেউ নেই। ছেলেরা হাত ওঠালো কিন্তু ড্রাইভার এক নজর তাকিয়ে দেখেই লরীটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল। তারপর একটা গাড়ি এগিয়ে এলো। ড্রাইভার ছাড়া আর একজন মাত্র আরোহী ছিল গাড়িটাতে। কিন্তু এই গাড়িটাও হুস্ করে চলে গেল। গুরিক বলে উঠলো, 'কী আপদ!'

ভাস্কা এবার বললো, 'তোমরা সবাই মিলে হাত তুলছো কেন বল তো? কি বোকামি! ওরা ভাবছে আমরা সকলে মিলে বুঝি গাড়িতে যেতে চাইছি। ঝেঙ্কা, তুমি এগিয়ে এসে

একা হাত দেখাও তো। ঐ যে, আরেকটা 'গাড়ি আসছে...' ছেলেরা সবাই ভাস্কার নির্দেশ মেনে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। গাড়িটা এগিয়ে আসতেই ঝেঙ্কা হাত তুললো শুধু। ভাস্কা নিজেই নিজের নির্দেশ অমান্য করলো। বড় ছেলেরা অবশ্য ছোটদের যা করতে বলবে নিজেরা কখনও তা করবে না, এটাই ওদের রীতি। গাড়িটা একটু এগিয়ে গিয়ে তারপর আচমকা থেমে গেল।

ঝেঙ্কা বাক্স হাতে দৌড়ে গেল। ভাস্কাও এগিয়ে গেল কোটটা হাতে নিয়ে। ক্লিক করে দরজাটা খুলে যেতে ঝেঙ্কা এক লহমায় গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কাও গাড়ির ভেতর উধাও। তারপর একরাশ ধুলো উড়িয়ে চারদিক অন্ধকার করে দিয়ে গাড়িটাও উধাও হয়ে গেল। ধুলো একটু কমলে ওরা অবাক হয়ে দেখলো ঝেঙ্কা আর ভাস্কাকে নিয়ে গাড়িটা ততক্ষণে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। এবার বুঝলো ভাস্কা ওদের সঙ্গে কি চালাকি করলো। কাউকে কিছু না বলে কেমন কৌশল করে ঝেঙ্কার সঙ্গে গাড়িতে চড়ে সেও স্টেশনে চলে গেছে! ওরা আর কি করবে? মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে চললো। বাতাসটা এবার ওদের পিঠের ওপর আছড়ে পড়ে ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে যেন। শেরিওঝার ঝাঁকড়া চুলগুলো এলোমেলো হয়ে তার চোখে মুখে পড়ছে বার বার।

লিডাই প্রথম নীরবতা ভেঙ্গে কথা বললো, 'ঝেঙ্কার জামাটা একেবারে ছেঁড়া। বেচারা! মাসী ওকে একটাও জামা তৈরী করিয়ে দেয়নি।'

গুরিক বললো, 'মাসী বেচারীই বা কি করবে বল? যেখানে কাজ করে সেখানকার ম্যানেজারটা মহা পাজী, রীতিমত ঠকায় ওকে।'

এদিকে শেরিওঝা বাতাসের ধাক্কায় পথ চলতে চলতে অন্য কথা ভাবছিল। সে ভাবছে ঝেঙ্কাটা কী ভাগ্যবান! কেমন মজা করে ট্রেনে চড়বে! জন্মে অবধি শেরিওঝা তো কোন দিন ট্রেনে চড়েনি!······

সহসা আকাশ কেমন কালো থমথমে হয়ে এলো······ এদিক থেকে ওদিকে আকাশের বুক চিঁড়ে একটা আগুনের হল্‌কা চলে গেল······তারপরই ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি নেমে এলো ওদের ওপর। ওরা প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে আর দৌড়োচ্ছে। কাদায় পা পিছলে যেতে চায়। সমস্ত আকাশ জুড়ে বিত্যুতের নাচানাচি সুরু হয়েছে, বাতাসের মাতামাতির সঙ্গে বাজ পড়ার হুঙ্কারও শোনা যাচ্ছে। ছোট্ট ভিক্টর ভয় পেয়ে এবার কাঁদতে সুরু করলো।

এমনি করে ঝেঙ্কা সত্যি ওদের ছেড়ে চলে গেল। কিছুদিন পর ওর হু'টো চিঠি এলো, একটা ভাস্কার কাছে, আরেকটা ঝেঙ্কার মাসীর কাছে। ভাস্কাকে ও কি লিখেছে ওদের কাউকে কিছু বললো না। এমন হাবভাব করলো যেন কত গোপন কথা লেখা আছে চিঠিটাতে। কিন্তু মাসীর কাছ থেকেই সবাই জানতে পারলো ঝেঙ্কা বোর্ডিং-স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং এখন হোস্টেলে থাকে। ওরা নাকি ওকে একটা নূতন পোশাকও দিয়েছে। মাসী চারদিকে বলে বেড়াচ্ছে,

'যাক, ছেলেটার একটা হিল্লে করে দিতে পারলাম বলে ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ। এখন ছোঁড়াটা মানুষ হয়ে যাবে। আমিই তো সব করলাম!'

ঝেঙ্কা কোনদিনই ওদের দলের সর্দার হতে পারেনি। ও একটু ভাবুক প্রকৃতির ছিল বলেই সর্দারী মোড়লী করতে পারতো না। তাই ছেলেরা ক্রমে ক্রমে ওর কথা ভুলে যেতে লাগলো। মাঝে মাঝে যখন ওরা ওকে মনে করতো তখন শুধু ভাবতো ঝেঙ্কা ওখানে কেমন আরামেই আছে—বিছানার পাশে আলমারী, ওকে আনন্দ দেবার জন্য কত নাচ গান। সৈন্য সৈন্য খেলবার সময় এখন শুরিক বা শেরিওঝাই সেনাপতি সাজে।

বড়দিদিমার শবযাত্রা

বড়দিদিমা নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। দু'দিনে ধরে সবাই বলাবলি করলো তাকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া উচিত, কিন্তু কেউই আর গিয়ে উঠতে পারলো না। তারপর তৃতীয় দিন হঠাৎ দিদিমা এসে উপস্থিত। তখন বাড়িতে শুধু শেরিওঝা আর মাসী আছে। দিদিমা আগের চাইতেও যেন আজ অনেক বেশি গুরুগম্ভীর। গতানুগতিক কুশল প্রশ্নের পর দিদিমা বসে পড়ে বললো, 'মা মারা গেছেন।' মাসী তক্ষুণি হাত দু'খানি বুকে রেখে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললো, 'তাঁর আত্মার শান্তি হোক।'

দিদিমা এবার তার সেই কালো বড় ব্যাগটা খুলে একটা কুল বের করে শেরিওঝার দিকে এগিয়ে ধরলো। তারপর বললো, 'আমি মায়ের জন্য কয়েকটা জিনিস নিয়ে যেতে ওরা বললো মা আর নেই, ঘণ্টা দুয়েক হোল মারা গেছেন। এই যে নাও শেরিওঝা, কুলগুলো ধোয়াই আছে, খেয়ে ফেল। বেশ মিষ্টি। মা খুব ভালবাসতেন। চায়ের মধ্যে রেখে নরম করে নিয়ে তিনি খেতেন। ওগুলো তুমিই নাও, খেয়ে ফেল।' দিদিমা ব্যাগ থেকে অনেকগুলো কুল বের করে টেবিলের ওপর রাখলো।

মাসী এবার বললো, 'সব ওকে দিয়ে দিচ্ছেন কেন? আপনিও কয়েকটি খান।'

দিদিমা কাঁদতে স্বুরু করলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'না, আমি খাব না। মায়ের জন্য কিনেছিলাম।'

'ওঁর বয়স কত হয়েছিল?' মাসী প্রশ্ন করলো।

'বিরাশি বছর। অনেকে তো আরও কত বেশী দিন বাঁচে। মা আমার নব্বুই বছর বাঁচলেই বা কি হোত!'

মাসী উঠে গিয়ে এক গ্লাস দুধ এনে দিদিমার সামনে ধরে বললো, 'নিন, এটা খেয়ে ফেলুন তো। খেলে একটু ভাল বোধ করবেন। শোক দুঃখ মানুষের জীবনে আছেই, তবুও আমাদের খেতে হবে, চলতেও হবে।'

নাক ঝেড়ে চোখ মুছে দিদিমা 'ধন্যবাদ' বলে গ্লাসটি হাতে নিয়ে চুমুক দিল। দুধটা খেয়ে ফেলে একটু চুপ করে থেকে বললো, 'আমি যেন মাকে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছি। মা কত বিদ্বান্ ছিলেন, কী পড়াশুনোটাই না করতে পারতেন। কত কি জানতেন। এখন তো শূন্য পুরীতে থাকতে হবে আমাকে। কি করে থাকবো ? ভাড়াটে বসাতে হবে, না হয় একলা আমি মরেই যাব।'

মাসী দরদ-ভরা কণ্ঠে বললো, 'আহা !'

কুলগুলো দু'হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে শেরিওঝা এবার উঠানে বেরিয়ে এলো। মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে বসে ও কত কি ভাবতে লাগলো। দিদিমার বাড়ি শূন্য হয়ে গেছে বললো কেন ? তাহলে বড়দিদিমা আর নেই, মারা গেছে বুঝি। ওরা দু'জনেই তো এক সঙ্গে থাকতো। তাহলে বড়দিদিমা বুঝি এই দিদিমার মা ? এখন থেকে দিদিমার ওখানে বেড়াতে গেলে আর কেউ ভুরু কুঁচকে মুখ ভঙ্গি করে ওকে বকবে না, ক্ষেপাবেও না।

মৃত্যু কাকে বলে শেরিওঝা জানে। মৃত্যু কয়েকবার ও দেখেছে। একবার ও ওদের হুলো বেড়ালটাকে একটা ইঁদুরছানা মারতে দেখেছে। মেরে ফেলবার আগে ইঁদুর-ছানাটাকে নিয়ে বেড়ালটা এদিক ওদিক কেমন খেলা করেছে। তারপর আচমকা একটা লাফ দিয়ে ইঁদুরছানাটাকে গপ্ করে টুঁটি চেপে ধরে ওর লাফালাফি এক নিমেষে ঘুচিয়ে দিল। তারপর বেশ আমিরী চালে ওটাকে খেতে লাগলো থ্যাবড়া লোভী মুখটাকে নেড়েচেড়ে। আর একবার ও একটা মরা বেড়াল ছানা দেখেছে, এক মুঠো নোংরা তুলো যেন। মরা প্রজাপতি তো কতই দেখেছে। ওদের অপূর্ব সুন্দর

ডানাগুলো জায়গায় জায়গায় কেমন খুলে গেছে আর ফুলের রেণুর মত যে মিহি কণাগুলো ওদের ডানার ওপরে ছড়িয়ে থাকে সেগুলোও কোথায় উঠে গেছে! পুকুরের প্যাড়ে অনেক মরা মাছও পড়ে থাকতে দেখেছে। ওদের রান্না ঘরের টেবিলে তো প্রায়ই মরা মুরগীছানা দেখতে পায়। রাজহাঁসের মত লম্বা গলার এক জায়গায় ছোট্ট কালো একটা ফুটো দিয়ে একটা পাত্রের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ে। মা কিংবা মাসী মুরগীছানা মারতে জানে না কিন্তু। লুকিয়ানিচই এই কাজটা করে। খাঁচার মধ্যে হাত বাড়িয়ে লুকিয়ানিচ একটা ছানাকে ধরলেই ওরা সবাই মিলে কিচির মিচির করে ডানা ঝটপট করতে থাকে। ওদের এই করুণ কান্না শুনতে শেরিওঝার ভাল লাগে না বলে ও দৌড়ে পালায় তখন। তারপর রান্না ঘরে ঢুকলে ও আড় চোখে মরা মুরগীছানাটার দিকে তাকায় আর ঐ ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দেখে ওর গা কেমন গুলিয়ে ওঠে। মনটা ভারী খারাপ হয়ে যায়। ওরা বলে এখন আর ওটার জন্য কষ্ট লাগবার নাকি কোন কারণ নেই। মাসী তার নিপুণ হাতে পালক ছাড়াতে ছাড়াতে বলবে, 'এখন আর এটা কিছুই অনুভব করতে পারছে না।'

শেরিওঝা একবার একটা মরা চড়ুই ছুঁয়ে ফেলেছিল। এত ঠাণ্ডা আর শক্ত ছিল যে ও ভয় পেয়ে তক্ষুনি হাত সরিয়ে নিয়েছিল। বরফের টুকরোর মত ঠাণ্ডা চড়ুই বেচারী সকাল বেলাকার নরম রোদের আঁচে তেতে ওঠা লাইলাক ঝোপের

কোলে ঘুমিয়ে আছে, আর কোন দিন জেগে উঠে কিচিরমিচির করে গান গাইবে না।

একেবারে ঠাণ্ডা নিথর হয়ে যাওয়াকেই তাহলে মৃত্যু বলে!

সেই মরা চড়ুই দেখে লিডা সেদিন বলেছিল, 'এসো, ওকে শোভাযাত্রা করে কবর দিতে নিয়ে যাই।' তারপর ও ছোট্ট একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স এনে তার মধ্যে ছেঁড়া ন্যাকড়া পেতে, হিজিবিজি জিনিস দিয়ে ছোট্ট একটা বালিশ তৈরী করে, চারধারে লেসের জালি দিয়ে পরিপাটি করে একটা বিছানা পেতে ফেললো। লিডা সত্যিই সব কাজে অদ্ভুত পটু একথা স্বীকার করতেই হবে। তারপর ও শেরিওঝাকে একটা গর্ত খুঁড়তে বললো। বাক্সের মধ্যে মরা চড়ুইটাকে শুইয়ে দিয়ে বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করে সেই গর্তের ভেতরে বাক্সটা ঢুকিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিল। লিডা সেই মাটির মাঝখানটিতে একটা গাছের ডাল সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর বললো, 'দেখ, কেমন সুন্দর ভাবে ওকে আমরা কবর দিয়ে দিলাম। এটা কি ও আশা করেছিল নাকি?'

ভাস্কা আর ঝেন্কা এই শবযাত্রায় কোন অংশ নেয়নি সেদিন। ওরা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে একটু দূরে বসে দুঃখিত ভাবে আনমনে শুধু ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। কিন্তু এ নিয়ে ওদের এতটুকু উপহাসও করেনি। মানুষরাও মাঝে মাঝে মরে যায় একথাও সে জানে। তখন কফিন বলে লম্বা একটা বাক্সের মধ্যে তাদের পুরে রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা

করে নিয়ে যাওয়া হয়। শেরিওঝা দূর থেকে অনেকবার তা দেখেছে। কিন্তু মরা মানুষ সে কখনও দেখেনি।

মাসী একটা প্লেটে একরাশ সাদা ধবধবে ভাত বেড়ে তার চারপাশে লাল মিষ্টি সাজিয়ে ঠিক মাঝখানটিতে ভাতের ওপর কয়েকটি মিষ্টি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল, ঠিক যেন ফুলও নয়, আবার তারাও নয়।

শেরিওঝা প্রশ্ন করলো, 'তারা করলে বুঝি ?'

'না, তারা নয়। এটা ক্রশ করেছি। আমরা বড়দিদিমার শবযাত্রায় যাচ্ছি কি না।'

তারপর মাসী ওকে হাতমুখ ভাল করে ধুইয়ে মুছিয়ে জামা জুতো মোজা পরিয়ে দিল। নাবিকের নীল স্যুটটা আর নীল টুপি ওকে পরানো হোল। আজ ওকে যেন বিশেষ যত্ন করে বিশেষ সাজেই সাজানো হোল। মাসীও ভাল করে সেজে কালো লেসের স্কার্ফটা গলায় জড়িয়ে নিল। তারপর সাদা রুমালে সেই ভাতের প্লেটটা বেঁধে এক হাতে সেটা আর অন্য হাতে ফুলের একটা তোড়া নিল। শেরিওঝার হাতেও মাসী দু'টো বড় বড় ডালিয়া দিল। শেরিওঝা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে ভাস্কার মা বালতি হাতে জল আনতে যাচ্ছে। ও আনন্দে চীৎকার করে উঠলো, 'নমস্কার। আমরা বড়দিদিমার শবযাত্রায় যাচ্ছি।'

লিডা তখন ওদের বাড়ির দরজায় ভিক্টরকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে শেরিওঝা বুঝতে পারলো লিডাও

ওদের সঙ্গে আসতে চায়। কিন্তু ওর ফ্রকটা যা ছেঁড়া আর ময়লা! শেরিওঝা আজ কেমন সেজেছে আর লিডা ঐ বিশ্রী পোশাকে খালি পায়ে যাবে কেমন করে? সত্যি, ওর জন্য শেরিওঝার বড্ড কষ্ট হচ্ছে কিন্তু। তাই ইচ্ছে না থাকলেও ওকে ডেকে বললো, 'এসো না আমাদের সঙ্গে। কি আর হবে, যেমনটি আছ ঠিক তেমনিটিই চলে এসো।'

কিন্তু লিডা অহংকারী মেয়ে। একটা কথাও না বলে পথের বাঁকটিতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে হিংসুটে দৃষ্টি মেলে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো শুধু।

ওরা এবার বাঁকটা ঘুরে অলিগলি দিয়ে চললো। উঃ! কী গরম লাগছে! দু'দুটো বিরাট ডালিয়া ও আর যেন বইতে পারছে না! তাই মাসীকে ও বললো, 'ফুল দু'টো তুমি নাও। আমি আর পারছি না।'

মাসী ওর হাত থেকে ফুল নিল কিন্তু তারপরেও ও হোঁচট খেতে খেতে চললো। পথের ওপর কাঁকর পাথর কিছু নেই তবুও ও হোঁচট খাচ্ছে। মাসী এবার প্রশ্ন করলো, 'কি, ব্যাপারটা কি বলতো? কি হয়েছে তোমার শুনি?'

'গরম লাগছে যে! এত কাপড়-চোপড় পরে থাকা যায় নাকি? কোটটা খুলে নাও, আমি শুধু শার্ট প্যান্ট পরেই যাব।'

'বোকার মত কথা বোলো না তো। শবযাত্রায় কেউ কখনও শুধু প্যান্ট পরে যায় নাকি? এই যে আমরা বাস-স্টপে এসে গেছি। এক্ষুণি বাসে উঠবো।'

বাসে উঠবে জেনে শেরিওঝা একটু উৎসাহ নিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করলো। কিন্তু পথ কি আর ফুরোতে চায়? এর যেন শেষ নেই! সামনে থেকে একরাশ ধুলো উড়িয়ে একদল গরু আসছে দেখে মাসী ওকে বললো, 'এবার আমার হাত ধরো তো।'

শেরিওঝা বললো, 'জল খাব। তেষ্টা পেয়েছে।'

'বোকামো করো না! এখন তোমার তেষ্টা পেতেই পারে না।'

মাসীটা যেন কী! কেন বিশ্বাস করছে না যে ওর সত্যি সত্যিই খুব তেষ্টা পেয়েছে? কিন্তু মাসীর ঐ ধমকে এখন আর তেমন করে জল খেতে মন চাইছে না।

গরুগুলো ওদের গুরুগম্ভীর মাথাগুলো হেলিয়ে দুলিয়ে ভরা বাঁট নিয়ে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

তারপর ময়দানের কাছে এসে ওরা বাসে চাপলো। বাসের এক কোণে বাচ্চাদের বসবার নির্দিষ্ট জায়গায় সে বসলো। শেরিওঝা বাসে খুব কমই চড়েছে। তাই আজকের দিনটা তার জীবনে সব দিক দিয়ে একটা বিশেষ দিনই বলতে হবে। হাঁটু মুড়ে বসে সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে লাগলো, আবার মাঝে মাঝে তার পাশের সঙ্গীটিকেও দেখতে লাগলো। সঙ্গীটি তার চাইতে বয়সে অনেক ছোটই হবে, তবে দেখতে বেশ নাতুসনুতুস কিন্তু। গোলাপী রেউড়ি চুষছে ছেলেটা। ওর গাল দু'টো চিনির রসে জবজবে হয়ে গেছে। শেরিওঝার দিকে ও কেমন গর্বভরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ওর

সেই দৃষ্টি যেন শেরিওঝাকে বলছে—দেখ, আমি কেমন খাচ্ছি। তোমার তো নেই।

কনডাকটার ওদের কাছে এসে দাঁড়াতেই মাসী তাকে প্রশ্ন করলো, 'এই বাচ্চাটার ভাড়া লাগবে নাকি ?'

কনডাকটার তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'খোকা, এদিকে এসো তো, মেপে দেখি।'

বাসের গায়ে একদিকে একটা কালো দাগ আছে বাচ্চাদের উচ্চতা মাপবার জন্য। যে বাচ্চার মাথা সেই দাগটাকে ছুঁতে পারবে তার জন্য টিকিট লাগবে। শেরিওঝা সেই দাগ পর্যন্ত এসে ওর পায়ের আঙ্গুলের ওপর একটুখানি উঁচু হয়ে দাঁড়ালো। কনডাকটার রায় দিল, 'হাঁ, এর টিকিট লাগবে।'

শেরিওঝা এবার গর্বিত ভাবে সেই মোটাসোটা ছেলেটার দিকে তাকালো। ভাবটা যেন এই—তোমার জন্য তো টিকিট লাগেনি, কিন্তু আমার টিকিট লাগছে। কিন্তু এই নাদুসনুদুস ছেলেটারই শেষ পর্যন্ত জিত হলো, কারণ শেরিওঝা আর মাসীর যখন বাস থেকে নামবার সময় এলো ছেলেটি তখনও বেশ নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় বসে রয়েছে—ও বোধ হয় অনেক দূরে যাবে।

ওরা বাস থেকে নেমেই একটা শ্বেত পাথরের বিরাট ফটকের সামনে এসে পড়লো। ফটকের ওদিকে অনেকগুলো লম্বা লম্বা সাদা বাড়ি। বাড়িগুলোর চারধারে ছোট ছোট গাছের সারি। গাছের গুঁড়িগুলো সাদা রঙে রঙানো। নীল ড্রেসিং-গাউন পরা কত লোক এদিক ওদিক

বেড়াচ্ছে, অনেকে আবার বেঞ্চের ওপর বসে বসে গল্প করছে। শেরিওঝা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, 'এটা কি ?'

'হাসপাতাল'—জবাব দিল পাশা মাসী। সব শেষে যে বড় বাড়িটা এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে ওরা এবার সেদিকেই চললো। রাস্তার একটা বাঁক ঘুরতেই দেখলো কোরোসটিলেভ, মা, লুকিয়ানিচ আর দিদিমা দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় রুমাল বাঁধা তিন জন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। শেরিওঝা ওদের দিকে তাকিয়ে সাগ্রহে বলে উঠলো, 'আমরা বাসে করে এলাম।' কেউ তার কথার কোন উত্তর দিল না। মাসী মুখে আঙ্গুল দিয়ে শ্‌ শ্‌ শ্‌ করে উঠলো। সে এবার বুঝলো এখানে কথা বলা বারণ। ওরা অবশ্য চুপিচুপি ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছিল। মা মাসীর দিকে চেয়ে বললো, 'ওকে আবার আনলে কেন ?' কোরোসটিলেভ টুপি হাতে নিয়ে শান্ত অথচ চিন্তিত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। শেরিওঝা দরজার দিকে একটু এগিয়ে দেখলো একটা ছোট্ট অন্ধকার ঘরের দিকে কয়েকটি সিঁড়ি নেমে গেছে। এবার ওরা সবাই ধীর পায়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঐ ঘরটায় ঢুকলো।

প্রখর দিনের আলো থেকে এসে প্রথমে তো শেরিওঝা চোখে প্রায় অন্ধকারই দেখলো। তারপর একটু একটু করে দেখতে পেল দেওয়ালের দিকটায় একটা চওড়া বেঞ্চ পাতা রয়েছে। ঘরের মেঝেটা কী এবড়োখেবড়ো। মাঝখানটিতে বেশ অনেকটা উঁচুতে একটা কাঠের কফিন রয়েছে। কফিনটার চারধারে মসলিনের ঝালর। ঘরটা কী স্যাঁতসেঁতে,

কেমন একটা সোঁদা গন্ধ নাকে ঢুকছে। দিদিমা তাড়াতাড়ি সেই বাক্সটার কাছে এগিয়ে গিয়ে মাথা নত করে দাঁড়ালো। মাসীও তার কাছটিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলো, 'হায় ভগবান! একি কাণ্ড? দেখ, দেখ, ওঁর হাত দু'খানি কেমন দু'পাশে নামানো রয়েছে। বুকের ওপর রাখেনি কেন?'

দিদিমা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'মা ওসবে বিশ্বাস করতেন না।'

মাসী বললো, 'তাতে কি হয়েছে? এভাবে মিলিটারী কায়দায় ঈশ্বরের দরবারে যাওয়া যায় নাকি?' অন্য তিনজন ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে মাসী প্রশ্ন করলো, 'আপনারা কি বলেন?' ওরা তিনজনে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

শেরিওঝা এত নীচু থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এবার সে বেঞ্চের ওপর উঠে ঘাড় উঁচু করে কফিনটার ভেতরে তাকাবার চেষ্টা করলো। সে ভেবেছিল ওটার মধ্যে বড়-দিদিমাকেই দেখতে পাবে। কিন্তু ঠিক বড়দিদিমা তো নয়, অন্য একটা অদ্ভুত কিছু যেন ওখানে শুয়ে আছে। বড়দিদিমার মত কিছুটা দেখতে হলেও ভাঙ্গাচোরা মুখ আর হাড়গোড় বের করা থুত্‌নি......এতো বড়দিদিমা হতেই পারে না। তাহলে এটা কি......এভাবে মানুষ কি কখনও চোখ বন্ধ করে থাকে নাকি? লোকে ঘুমোলেও কিন্তু ঠিক এমন অদ্ভুতভাবে চোখ বন্ধ করে না। আর ওটা কী লম্বা...... কিন্তু বড়দিদিমা তো দেখতে ছোট্টখাট মানুষটি ছিল।

চারদিকে কেমন একটা ঠাণ্ডা স্যাতসেঁতে গুমোট ভাব। সবাই যেন গভীর দুঃখে মুষড়ে পড়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কি জানি সব ফিস্ ফিস্ করে বলছে। শেরিওঝার হঠাৎ কেমন ভয় করতে লাগলো। এখন যদি ওটা জীবন্ত হয়ে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে 'হাঁরে-রে' বলে চেঁচায় তাহলে কী সাংঘাতিক ব্যাপারই না হবে......একথাটা ভাবতেই শেরিওঝা প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলো।

শেরিওঝা চেঁচালো আর তক্ষুণি যেন ওপর থেকে, সূর্যের আলো থেকে একটা তীক্ষ্ণ প্রাণবন্ত পরিচিত স্বর তার চীৎকারের প্রত্যুত্তর দিল .....মনে হোল একটা গাড়ির ভেঁপু......মা ওকে এক হেঁচকা টানে ওখানে থেকে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ফটকের কাছে একটা লরী দাঁড়িয়ে ছিল। কত লোক এদিক ওদিক বেড়াচ্ছে। তোশিয়া মাসী লরীটার সামনে বসে আছে। এই মাসীই সেদিন কোরোসটিলেভের জিনিসপত্তর ওদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিল। তোশিয়া মাসী 'ব্রাইট শোর' ফার্মে কাজ করে আর মাঝে মাঝেই কোরোসটিলেভকে লরী করে নিয়ে যায়। মা শেরিওঝাকে মাসীর পাশে ধপ করে বসিয়ে দিয়ে বললো, 'এখানে বসে থাক', এবং দরজাটা বন্ধ করে দিল।

মা চলে গেলে মাসী ওকে প্রশ্ন করলো, 'বড়দিদিমাকে কবর দেওয়া দেখতে এসেছ? ওকে তুমি খুব ভালবাসতে বুঝি?

'না, একটুও ভালবাসতাম না।'

'তাহলে এসেছ কেন ? ওঁকে যদি ভাল না-ই বাস তাহলে কবর দেখতে আসতে নেই।'

বাইরের আলো আর এই কথাবার্তায় তার সেই অদ্ভুত ভয়টা, গা ছম্ ছম্ ভাবটা একটু কমলো। কিন্তু ঐ ছোট্ট সঁ্যাতসেঁতে ঘরটার অদ্ভুত দৃশ্য সে সহসা ভুলতে পারলো না। তার শরীরটা থেকে থেকে কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো, চারদিকে কয়েকবার তাকিয়ে কি জানি মনে মনে চিন্তা করে নিয়ে অবশেষে বললো, 'আচ্ছা, ঈশ্বরের দরবারে উপস্থিত হওয়ার অর্থ কি ?'

মাসী হেসে বললো, 'ও একটা কথার কথা।'

'কিন্তু ওরা এরকম করে কথা বলে কেন ?'

'বুড়োরা ওরকম কথাবার্তাই বলে থাকে। ওদের কথায় কান দিও না যেন। ওসব একদম বাজে কথা।'

তারপর ওরা দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো। মাসী তার সবুজে চোখ দুটোকে কেমন একটু ছোট করে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে বললো, 'হাঁ, আমরা সবাই ওখানে একদিন না একদিন যাব।'

ওখানে······কোনখানে ? কি বলছে ওরা ?···কিন্তু আরও স্পষ্ট করে সে কিছু জানতে চায় না, তাই আর প্রশ্ন করলো না। তারপর যখন কফিনটাকে ঐ অন্ধকূপ থেকে বার করে বাইরে বয়ে আনতে দেখলো তখন সে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। তবে এখন কফিনের ওপর ওর ডালাটা ফেলে দেওয়া হয়েছে এই যা বাঁচোয়া। কিন্তু ওদের এই লরীটাতেই

ওটাকে এনে তোলা হোল বলে সে বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

কবরখানায় পৌঁছে সবাই মিলে কফিনটাকে ধরাধরি করে ভেতরে বয়ে নিয়ে চললো। শেরিওঝা আর তোশিয়া মাসী লরী থেকে নামলো না। বাইরে গাড়ি দাঁড়াবার জায়গায় লরীটা দাঁড়িয়ে রইলো। শেরিওঝা কবরখানার ভেতরে দৃষ্টি মেলে দেখে চারদিকে কেবল ক্রুশ আর কাঠের পিলার এক একটা লাল তারা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শেরিওঝা আরও দেখলো ফটকের খুব কাছে একটা ঢিবির ফাটল দিয়ে লাল পিঁপড়ে সারি বেঁধে আসছে যাচ্ছে। অন্য অনেক-গুলো ঢিবিতে আবার মাটি ফুঁড়ে ছোট ছোট আগাছা জন্মেছে। শেরিওঝা এবার ভাবলো—আচ্ছা, এই কবর-খানাতেই সবাইকে একদিন আসতে হবে মাসী তাই বলেছে নাকি ?

কিছুক্ষণ পর ওরা সবাই ফিরে এলো। লরী আবার ওদের নিয়ে বাড়ির দিকে চললো। শেরিওঝা প্রশ্ন করলো, 'বড়দিদিমাকে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে নাকি ?'

তোশিয়া মাসী উত্তর দিল, 'হাঁ বাছা।'

বাড়ি ফিরে শেরিওঝা লক্ষ্য করলো পাশা মাসী ওদের সঙ্গে ফেরেনি। লুকিয়ানিচ বলছে, 'পাশা শবযাত্রীদের আগেকার দিনের মত মাংস খাওয়াবে। সারাদিন ধরে সব রান্না করে নিয়ে গিয়েছে।'

দিদিমা মাথার রুমালটা খুলে ফেলে হাত দিয়ে চুল

পরিপাটি করলো। তারপর বললো, 'ওদের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করে কি লাভ? ও আর ঐ তিনজন ভদ্রমহিলা এবার ভাতগুলো খেয়ে প্রার্থনা করবে। আর তাতেই যদি শান্তি পায় ওরা পাক না।'

ওরা সবাই আবার স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে সুরু করেছে। এমন কি একটু আধটু হাসছেও। মা আবার বললো, 'সত্যি, পাশার অনেক কুসংস্কার।'

কিছুক্ষণ পর ওরা টেবিলের চারপাশে খেতে বসলো। কিন্তু শেরিওঝা খেতে পারছে না! তার কেমন বমি বমি করছে। সে নীরবে বসে আছে আর ডাগর দু'টি চোখ মেলে বড়দের দিকে তাকিয়ে আছে শুধু। এতক্ষণ যা ঘটলো সে ওসব কিছু মনে করতে চায় না, ভাবতে চায় না। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘুরে ফিরে সব কথা তার ভাবনায় এসে পড়ছেই ······সেই গা ছমছমানি ভাবটা......স্যাঁতসেঁতে ঘরের কেমন আবছা অন্ধকার, গুমোট ভাব আর মাটির সোঁদা গন্ধ, সব মনে হচ্ছে। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, আমরা সবাই একদিন ওখানে যাব, ওকথা বললো কেন?'

বড়রা কথাবার্তা থামিয়ে ওর দিকে তাকালো এবার। কোরোসটিলেভ বললো, 'কে বললো একথা?'

'তোশিয়া মাসী।'

'তার কথা শুনো না তুমি। সব কথা কি শুনতে হয় নাকি?'

'কিন্তু একদিন আমরা সবাই তো মরবো?'

ওরা কেমন অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে! এই প্রশ্নটা করা যেন তার খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। সে সবার দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে রইলো ওরা কি বলে শোনবার জন্য। একটু পরে কোরোসটিলেভ বললো, 'না, আমরা কেউ মরবো না। তোমার তোশিয়া মাসীর ইচ্ছে হলে মরুকগে। কিন্তু আমরা মরবো না। বিশেষ করে তুমি কোনদিন মরবে না সেকথা আমি হলফ করে বলছি সোনা।'

'আমি কোনদিন মরবো না?'

'না, কোনদিন না।' কোরোসটিলেভ দৃঢ়স্বরে হাসিমুখে তার চোখে চোখ রেখে বললো। শেরিওঝা এবার নিজেকে কেমন হালকা বোধ করলো, সুখী মনে করলো। একটা খুশীর আমেজে ওর মনটা ভরপূর হয়ে উঠলো। এবার সে হাসতে সুরু করলো। কিন্তু আবার তার ভয়ানক তেষ্টা পেল যে! অনেকক্ষণ আগেই তো তার তেষ্টা পেয়েছিল, শুধু মাসীর ধমকে সেকথা এতক্ষণ বেমালুম ভুলে বসে ছিল। এখন গ্লাসের পর গ্লাস ঢক ঢক করে জল খেল সে প্রাণভরে বেশ মজা করে। কোরোসটিলেভ যা বলে তার মধ্যে এতটুকুও মিথ্যে নেই, তার প্রতিটি কথা সে সমস্ত মন দিয়ে বিশ্বাস করে। একদিন সে মরে যাবে একথা মনে হলে কি করে সে বাঁচবে, কেমন করেই বা আনন্দ করবে, খেলা করবে? আর কোরোসটিলেভ যখন বলেছে সে কোনদিন মরবে না তখন আর ভাবনা কিসের?

কোরোসটিলেভের ক্ষমতা

কতগুলো লোক এসে মাটিতে একের পর এক গর্ত খুঁড়লো। লম্বা লম্বা থাম সেই গর্তগুলোর মধ্যে পুঁতে দিয়ে সেগুলোর মাথায় তার বেঁধে দিয়ে গেল। শেরিওঝাদের বাড়ির উঠানের ওপর দিয়ে সেই তার আড়াআড়িভাবে চলে গিয়ে বাড়ির চারধারের দেওয়াল ঘিরে চললো। তারপর কালো রঙের একটা টেলিফোন ওদের খাবার ঘরের ছোট টেবিলের ওপরে রাখা হোল। ফার স্ট্রীটে এটাই নাকি প্রথম এবং একমাত্র টেলিফোন আর এটা হল কোরোসটিলেভের। কোরোসটিলেভের জন্যই ঐ লোকগুলো মাটিতে গর্ত খুঁড়লো, থাম বসাল তারপর তার বেঁধে দিয়ে এত কাণ্ড করলো! অন্য লোকদের টেলিফোন না হলেও চলে, কিন্তু কোরোসটিলেভের টেলিফোন না হলে চলে কি করে?

রিসিভারটা হাতে তুলে নিলেই একটা মেয়ে যাকে দেখতে পাচ্ছ না, অনেক দূর থেকে বলবে, 'এক্সচেঞ্জ'। তারপর কোরোসটিলেভ অফিসারের মত আদেশের সুরে বলবে, 'ব্রাইট শোর' অথবা 'পার্টি কমিটি' অথবা বলবে 'রিজিওন্যাল স্টেট ফার্ম অফিস'। তারপর সে চেয়ারে বসে লম্বা পা দুলিয়ে দুলিয়ে টেলিফোনে কথা বলতে থাকবে। আর এই কথা বলার সময় কেউ তাকে বিরক্ত করতে পারে না, এমন কি মা-ও না।

কখনও কখনও টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠলে শেরিওঝা দৌড়ে গিয়ে ওর ছোট্ট দুই হাতে রিসিভার তুলে

নিয়ে বলে 'হ্যালো!' আর ওদিক থেকে তক্ষুণি একটা স্বর কোরোসটিলেভকে ডেকে দিতে বলবে। কোরোসটিলেভকে কত লোকে চায়! আশ্চর্য! কিন্তু কই, লুকিয়ানিচ, মা অথবা মাসীকে তো কেউ একবার ডেকে দিতে বলে না। আর তাকে তো কেউ চায়ই না কোনদিন।

প্রতিদিন খুব ভোরবেলা কোরোসটিলেভ 'ব্রাইট শোরে' চলে যায়। তোশিয়া মাসী মাঝে মাঝে দুপুরে খাবার জন্য তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু প্রায়ই সে দুপুরে খেতে আসবার সময় পায় না। মা হয়তো 'ব্রাইট শোরে' ফোন করে ওকে খেতে আসবার জন্য ডাকে; কিন্তু ওখান থেকে বলে দেয় কোরোসটিলেভ কোথায় কি কাজে গেছে, ফিরতে দেরী হবে।

'ব্রাইট শোর' ফার্মটা সত্যি কী বিরাট! সেদিন কোরোসটিলেভের কি কাজে কোরোসটিলেভ আর তোশিয়া মাসীর সঙ্গে গাড়িতে চড়ে ওখানে বেড়াতে না গেলে সে তা বুঝতেই পারতো না কোনদিন। সেদিন ওরা গাড়ি করে চলেছে তো চলেছেই। ফার্মের ভেতরে পথের যেন আর শেষ নেই। গাড়ির দুপাশে বিরাট জমি এসে আছড়ে পড়ছে যেন। পথের দু' ধারে বিরাট বিরাট খড়ের গাদা উঁচু পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে মিশেছে দিগন্তে ছড়ান লাইলাক ঝোপের গায়ে। মাঠের পর মাঠ ধানক্ষেত, গমক্ষেত। কচি সবুজ ধানের শিষগুলো মাথা দুলিয়ে নাচছে যেন। অন্তহীন সবুজ ফিতের মত পথ এসে গাড়ির সামনে লুটিয়ে পড়ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে পিছনে। দৈত্যকায় লরী আর

ট্রাকটারগুলো ট্রেইলারগুলোকে টেনে টেনে সেই রাস্তার বুক দিয়ে হুক্‌হুক্‌ করে যাচ্ছে আসছে। শেরিওঝা 'এটা কোন্‌ জায়গা' প্রশ্ন করতেই বার বার একই উত্তর শুনছিল, 'ব্রাইট শোর, ব্রাইট শোর ফার্ম'।

ফার্মের তিনটে প্রকাণ্ড বাড়ি আলাদাভাবে এই বিরাট বিস্তৃত জায়গায় এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাড়ির মাথার ওপর বিরাট একটা গম্বুজ। অন্য বাড়িটায় যন্ত্রপাতির কারখানা। সেই কারখানায় রাতদিন ঝন্‌ঝনাত্‌ শব্দে কাজ চলছে। গন্‌গনে ফারনেস থেকে আগুনের ফুলকি বার হচ্ছে। হাতুড়ি পেটাবার একঘেয়ে বিকট শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেখানেই ওরা গাড়ি থামাচ্ছিল সেখান থেকেই লোক বেরিয়ে এসে কোরোসটিলেভের সঙ্গে কথা বলছিল।

কোরোসটিলেভ কারখানায় সব দেখাশুনো করছিল, নানা প্রশ্ন করছিল, কি ভাবে কি করতে হবে না হবে নির্দেশ দিয়ে গাড়িতে আবার চলছিল। শেরিওঝা এখন ঠিক বুঝতে পারলো কেন সে এত তাড়াতাড়ি রোজ সকালবেলা ফার্মে চলে যায়। কোরোসটিলেভের নির্দেশ ছাড়া কোন কাজ করা যে ওদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

তারপর ফার্মের ভেতরে কত রকম পশু পাখিই না রয়েছে। শূকর, ভেড়া, মুরগী, হাঁস, গরুই বেশী। গরম পড়লে গরুগুলি বাইরের মাঠে চড়ে খায়। বর্ষার দিনে থাকবার অস্থায়ী আস্তানাগুলো তখনও ছিল। কিন্তু এখন গরুগুলো গোয়াল ঘরেই যার যার জায়গামত দাঁড়িয়ে আছে। এক একটা কাঠের

গুঁড়ির সঙ্গে ওদের শিঙ লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে। সামনে লম্বা চৌবাচ্চা থেকে ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আনন্দে লেজ নেড়ে নেড়ে খাবার খাচ্ছে। কিন্তু ওরা বড্ড অসভ্য আর অভদ্র। একটু পরে পরেই ওরা পায়খানা করছে আর কেউ না কেউ দৌড়ে এসে তক্ষুণি গোবরগুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছে। ওদের এই বিশ্রী অভদ্র কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে শেরিওঝার কিন্তু বড্ড লজ্জা করছিল। পিছল মেঝের ওপর দিয়ে কোরোসটিলেভের হাত ধরে পা টিপে টিপে চলতে চলতে সে লজ্জায় মরে গিয়ে ওদের দিকে তাকাতেও পারছে না যেন। কিন্তু কোরোসটিলেভ ওদের গায়ে বেশ হাত চাপড়ে আদর করে লোকদের কি সব নির্দেশ দিচ্ছে, এসব কাণ্ডকারখানা যেন দেখেও দেখছে না।

একটি মেয়ে এসে কোরোসটিলেভের সঙ্গে কি একটা বিষয়ের তর্ক স্নুরু করে দিল।

কোরোসটিলেভ গম্ভীর স্বরে শুধু বললো, 'ঠিক আছে, আর একটিও কথা নয়, যা করছো কর গিয়ে।' মেয়েটি তক্ষুণি নীরবে কাজে চলে গেল। নীল টুপি মাথায় আর একটি মেয়ের কাছে এসে কোরোসটিলেভ এবার বললো, 'এজন্য দায়ী কে? আমাকে কি এসব ছোট খাট ব্যাপার নিয়েও মাথা ঘামাতে হবে নাকি?'

মেয়েটি থতমত খেয়ে ক্ষীণস্বরে উত্তর করলো, 'ভুলে গিয়েছিলাম। কেন যে এমন ভুল হোল বুঝতে পারছি না।'

এমন সময় লুকিয়ানিচ কোথা থেকে একটা কাগজ হাতে

নিয়ে তাদের সামনে এসে উপস্থিত হোল। কোরোসটিলেভের হাতে একটা পেন দিয়ে সে কাগজটা তার সামনে ধরে বললো, 'এই যে সই করে দিন দয়া করে।'

কোরোসটিলেভ তখনও সেই মেয়েটাকে ধমকাচ্ছে তাই লুকিয়ানিচের দিকে চেয়ে বললো, 'পরে হবে।'

কিন্তু লুকিয়ানিচ বললো, 'না, পরে হলে চলবে না। আপনার সই ছাড়া ওরা আমায় মাইনে দেবে কেন? আর টাকা না পেলে তো আর লোকের চলে না!'

শেরিওঝা অবাক হয়ে ভাবলো, তাহলে কোরোসটিলেভের সই ছাড়া কেউ বেতন পাবে না!

তারপর শেরিওঝা আর কোরোসটিলেভ হলদে পুকুর-গুলোর মাঝ দিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে ঠিক তখন একটি যুবক ওদের সামনে দৌড়ে এলো। তার পরিপাটি সাজসজ্জা, পায়ে চকচকে বুট জুতো, ঝকঝকে সুন্দর বোতাম লাগানো জ্যাকেট গায়ে। কোরোসটিলেভের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি আকুল স্বরে বললো, 'দিমিট্রি কোরনিয়েভিচ, আমি এখন কি করি? ওরা আমাকে থাকবার জায়গা দিচ্ছে না।'

কোরোসটিলেভ গম্ভীরভাবে বললো, 'কেন, তুমি বুঝি ভেবেছিলে তোমার জন্য ওরা নূতন বাড়ি তৈরী করে রেখেছে?'

ছেলেটি আবার বলছে, 'তা হলে আমার কি হবে? আমি যে বিয়ে করেছি। থাকবার জায়গা না পেলে তো সর্বনাশ। আপনি আপনার আদেশ ফিরিয়ে নিয়ে দয়া করে আমাকে আবার এখানে নিয়ে নিন।'

কোরোসটিলেভ আরও গম্ভীর হয়ে বললো, 'সে কথা তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিল। কাঁধের উপর মাথাটা আছে কি করতে ?'

'আপনার কাছে মানুষ হিসাবে অনুরোধ জানাচ্ছি দিমিট্রি কোরনিয়েভিচ। আপনি কি আমার অবস্থাটা অন্তর দিয়ে বুঝবেন না ? আমি একেবারেই আনাড়ি। নূতন জীবন সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না। তাই ব্যাপারটার গুরুত্ব আমি বুঝতেই পারিনি।'

'নিজের কাজটি ছেড়ে একেবারে অন্য লাইনে চলে গেছ আরও অনেক টাকা রোজগার করবে বলে, সেদিক থেকে তো অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছ !' কোরোসটিলেভ এবার মুখ ঘুরিয়ে পা বাড়ালো। কিন্তু ছেলেটি কী নাছোড়বান্দা !

'না, না, আপনি আমায় দয়া করুন। আমি ভুল করেছি, সেজন্য এখন অনুতপ্ত, আমাকে ক্ষমা করে আর একবার একটা সুযোগ দিন। আমাকে কাজে নিয়ে নিন ...'

'আচ্ছা বেশ, তাই না হয় হবে। কিন্তু মনে রেখো আবার যদি এমনটি কর তাহলে আর কোন কথাই শুনবো না ; এই তোমার শেষ সুযোগ।'

'ওদের কথা শুনে এই কাজটি ছেড়েই আমি ভুল করেছি। ওরা আমাকে হোস্টেলে শোবার ব্যবস্থা করে দেবে বলেছিল, তাও কখন হবে ভগবানই জানেন। আমি কিছু না ভেবে, না বুঝে তাতেই রাজী হয়ে গেলাম, এখন তো বুঝতে পারছি বোকার মত কী ভুলই না করেছি।'

'স্বার্থপর, বুদ্ধু ছেলে, কেবল নিজের কথাটাই তো ভেবেছ! যাও, এই শেষবারের মত ক্ষমা করলাম। কাল থেকে কাজে আসবে। যাও, এখন চোখের সামনে থেকে চলে যাও বলছি।'

ছেলেটি এবার হাসিমুখে বলে উঠলো, 'আচ্ছা, যাচ্ছি।'

একটু দূরে দাঁড়ানো রুমাল মাথায় একটি মেয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটি খুশীভরা চোখে কি ইঙ্গিত করলো। কোরোসটিলেভ এতক্ষণে মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে জোরে বলে উঠলো, 'তোমার জন্য নয়, ঐ তানিয়ার কথা ভেবেই আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম মনে রেখো। ও তোমায় ভালবাসে, এটা তোমার মত ছেলের পক্ষে মস্ত বড় সৌভাগ্য জেনো।' কোরাসটিলেভ মেয়েটির দিকে হাসিভরা চোখে তাকালো। ওরা দু'জনে এবার হাত ধরাধরি করে যেতে যেতে কোরোস-টিলেভের দিকে সকৃতজ্ঞ চোখে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে চলে গেল।

কোরোসটিলেভ সত্যিই কী আশ্চর্য লোক! ইচ্ছে করলে তো সে ওদের দুঃখ দিতেও পারতো। কোরোসটিলেভ শুধু যে মস্ত বড় ক্ষমতাবান লোক তাই নয়, সে কত দয়ালুও বটে। মনটা তার কত নরম, তাই তো ওদের মুখে আবার হাসি ফুটলো। শেরিওঝা অবাক হয়ে ভাবলো এমন সুন্দর লোকটির জন্য মন গর্বে আনন্দে ভরে উঠবে না তো কি? এটা তার কাছে এখন জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, অন্য সবার চেয়ে কোরোসটিলেভ অনেক বেশী জ্ঞানী এবং ভাল।

আকাশ আর পৃথিবী

গরমকালে আকাশে তারা দেখা যায় না। শেরিওঝা যখন ঘুমোতে যায় আবার যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে, ছ'বারই বাইরে প্রচুর আলো থাকে। মেঘলা দিন হলে বা অঝোর ধারায় বর্ষা নামলেও দিনের এই আলো একেবারে নিভে যায় না, উপর থেকেই সূর্যের আলো আসে।

আকাশটা যখন শুধুই নীল থাকে, এক টুকরো মেঘও তার গায়ে লেগে থাকে না, শেরিওঝা তখন অবাক হয়ে লক্ষ্য করে সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা স্বচ্ছ আলোর পিণ্ড, এক টুকরো আয়নার মত দেখা যায়। ওটা নাকি চাঁদ, দিনের বেলায় ওর কোন প্রয়োজনই নেই ; কিছুক্ষণ আকাশের বুকে ওকে দেখা যায়, তারপর সূর্যের তেজ বাড়তে থাকলে ধীরে ধীরে ওটা কোথায় মুখ লুকিয়ে ফেলে। তখন ঐ বিরাট সীমাহীন আকাশের রাজত্বে সূয্যিমামার একচ্ছত্র আধিপত্য চলতে থাকে।

কিন্তু শীতকালে দিনগুলো কত ছোট হয়ে যায়। দিনের আলো নিভে রাতটা কত তাড়াতাড়ি এসে পড়ে। রাত্রে খাবার সময় হবার অনেক আগেই ফার স্ট্রীটের বরফ-ঢাকা বাগান আর বাড়ির সাদা ছাদগুলো তারাভরা আকাশের নীচে কেমন নির্জন নীরব হয়ে একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে। আকাশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তারার দল তখন জেগে ওঠে। ছোট বড় রকমারি কত তারা, বালুকণার মত ছোট্ট ছোট্ট

তারারাও আকাশের বুকে আলোর রেখা ছড়িয়ে মিটিমিটি তাকিয়ে আছে যেন। বড় বড় তারার দল কোনটা নীল, কোনটা সাদা আবার কোনটা বা সোনালী রঙের আভা ছড়িয়ে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। লুব্ধক তারার চারধারে চোখের পাতার মত সুন্দর আলোর ছটা, আকাশভরা ছোট বড় তারার দল আর ধূলিকণার মত ক্ষুদে ক্ষুদে তারাগুলো অদ্ভুত বিচিত্র এক রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করে, রাস্তার ওপর সেতুর মত 'ছায়াপথ' তৈরী করে রেখেছে।

শেরিওঝা আগে কোনদিন এমন করে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা দেখে নি। তারা সম্বন্ধে তার তেমন আগ্রহ এর আগে ছিলই না। সে জানতো না তারাদেরও যে আবার এক একটা নাম রয়েছে। তারপর একদিন মা ওকে ঐ ছায়াপথ, লুব্ধক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, লাল মঙ্গল গ্রহ, এইসব চিনিয়ে দিল। মা বললো, বড় তারা আর বালুকণার মত ছোট তারাগুলোরও নাকি আলাদা আলাদা নাম আছে। আর ওরা অ-নে-ক দূরে রয়েছে বলেই নাকি অত ছোট্ট দেখায়, নইলে ওরা নাকি অ-নে-ক বড় দেখতে। মঙ্গল গ্রহে তো এখানকার মত মানুষও নাকি বাস করে। শেরিওঝা তারাদের প্রত্যেকের নাম জানতে চায়, কিন্তু মার নাকি সবার নাম মনে নেই। একদিন মা সব জানতো, আজ সব ভুলে গেছে। তার বদলে চাঁদের বুকে পাহাড় দেখিয়ে দিল।

শীতকালে প্রত্যেকদিন কী বরফটাই না পড়ে! লোকে পথ পরিষ্কার করে একজায়গায় বরফের স্তূপ করে রাখে।

কিন্তু আবার আরও বেশি করে বরফ পড়তে সুরু করে আর সমস্ত পথ ঘাট, বাগান, বাড়ির ছাদ তুলোর মত সাদা বরফের কুচিতে ভরে যায়। বেড়ার ধারে থামগুলো সাদা বরফের টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলোকে বরফ পড়বার পর মনে হয় যেন সাদা ফুলের মালা পরে সেজেছে।

শেরিওঝা সারাদিন বরফ নিয়ে খেলা করে, বাড়ি তৈরী করে, দুর্গ তৈরী করে, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করে তারপর পাহাড়ের নীচে বরফের ওপর দিয়ে স্লেজে করে পাহাড়ের ঢালুতে নেমে যায়। তারপর কখন বাঁশ-ঝাড়ের ওপাশে দিনের আলো নিবু নিবু হয়ে শেষবারের মত আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে একেবারে নিভে যায়। সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসে মাটির বুকে। তখন স্লেজ গাড়িটাকে টানতে টানতে শেরিওঝা বাড়ি ফেরে, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছোট্ট মাথাটি পেছনে হেলিয়ে সে আকাশের বুকে একটু একটু করে ভেসে-ওঠা তারাদের দিকে তাকায়। সপ্তর্ষিমণ্ডল আকাশের মাঝখানে এইমাত্র যেন গুটিসুটি মেরে এসে বসলো ওর লম্বা লেজটা ছড়িয়ে। মঙ্গল গ্রহটা ওর লাল চোখ মেলে পিট পিট করে তারই দিকে বারবার তাকাচ্ছে। মঙ্গল গ্রহটা তো বিরাট বড়, তাহলে বুঝি ওখানেও লোক থাকে। শেরিওঝা ভাবতে লাগলো—আমার মত একটি ছেলে হয়তো এখন আমারই মত স্লেজ গাড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো তারও নাম শেরিওঝা······ভাবতে এতো ভাল লাগে······সে যদি এই মুহূর্তে ওখানে যেতে পারতো কী মজাটাই না হোত!

তার এই ভাবনার কথা কাকেই বা বলবে! যে শুনবে সেই হাসবে, ওকে ক্ষেপাবে, ঠাট্টা করবে আর তখন তার বেজায় রাগ হবে। কিন্তু কাউকে না বলতে পারলেও যে ভাল লাগে না! একমাত্র কোরোসটিলেভকেই বলা যায়। বাড়ি ফিরে এদিক ওদিক যখন কেউ ছিল না, সেই সুযোগে কোরোসটিলেভকে সে মনের কথা বলে ফেললো। কোরোস-টিলেভ কখনও তার কথা শুনে হাসে না, দরদ দিয়ে মন দিয়ে তার সব কথা শোনে। আজও সব শুনে ও একটুও হাসলো না। এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে বললো, 'হাঁ ঠিকই বলেছ। তোমার মত ছোট একটি ছেলে সেখানে নিশ্চয়ই আছে।' তারপর কি কারণে কি জানি শেরিওঝার দু'কাঁধ ধরে বেশ গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। শেরিওঝা অবাক হয়ে দেখলো তার চোখে কেমন একটু দুর্ভাবনার কালো ছায়া ফুটে উঠেছে।

শীতের সন্ধ্যায় খেলাধুলো শেষ করে ক্লান্ত হয়ে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে শেরিওঝা ঘরে ফিরে দেখে চুল্লি জ্বলছে আর কেমন গরম আমেজে ঘরখানি ভারি আরামদায়ক হয়ে উঠেছে। ঘরে এসে বসতেই তার শীত শীত ভাবটা কেটে গিয়ে শরীরটা বেশ গরম হয়ে ওঠে। একটু পরেই মাসী এসে তার বুট জুতো, মোজা, পায়জামা সব খুলে দিয়ে জুতো জোড়াটা গরম হবার জন্য চুল্লির ওপর তাকে রেখে দেয়। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে খাবার টেবিলে বড়দের সঙ্গে সে খেতে বসে। গরম দুধে চুমুক

দিতে দিতে সে বড়দের গল্প শোনে আর আসছে কালের কথা ভাবে। আজ যে বরফের দুর্গ সে বানিয়েছে কাল আবার কেমন করে সেটা আক্রমণ করে দখল করবে, মনে মনে তাই ভাবতে থাকে।······সত্যি, শীতকালটা ভারি মজার। কিন্তু একটা ভীষণ অসুবিধা, শীতকালটা যেন আর যেতেই চায় না।

মোটা ভারি ভারি পোশাক পরতে কত আর ভাল লাগে! ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়ার জ্বালায় মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে যেতে হয়। স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে ছোটখাট জামা প্যাণ্ট পরে এক দৌড়ে বাইরে চলে যাও, পুকুরে ঝাঁপিয়ে পরে সাঁতার কাটো, ঘাসের বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাক, মাছ ধরতে যাও মাছ পাও আর নাই পাও, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পোকা বের করে সেগুলো বঁড়শীতে বেঁধে মাছ ধরতে ধরতে চেঁচিয়ে বলে ওঠো, 'শুরিক, তোমার টোপ খেয়েছে দেখ। বঁড়শীতে মাছ ঠোকরাচ্ছে দেখ।' শীতকালটায় এসব কিছুই কিন্তু করা যায় না। কেবল ঠাণ্ডা, বিশ্রী বাতাস আর বরফের দৌরাত্ম্য চারদিকে। কত আর ভাল লাগে বল এমন হতচ্ছাড়া শীতকালটাকে······

কিছুদিন পর জানালার কাঁচের গা বেয়ে বেয়ে তেরছা ধারায় বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে সুরু করে। বরফের বদলে প্যাঁচপেচে কাদায় রাস্তাঘাট অলিগলি এবড়োখেবড়ো হয়ে ওঠে। শীতের পর বসন্তের আবির্ভাব বুঝি এমনি করেই হয়। নদীতে বরফের স্তূপে একটু একটু করে ফাঁটল ধরতে থাকে। শেরিওঝা অন্য সাথীদের সঙ্গে দল বেঁধে তাই দেখতে ছুটে

যায়। বরফের বিরাট স্তূপগুলো একটু একটু করে গলতে সুরু করে নদীর জলের ধারার সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর নদীর কুল ছাপিয়ে উপচে পড়ে। নদীর একপাশে উইলো গাছগুলির অর্ধেক জলে ডুবে যায়, ডালপালাগুলো জলের ওপর খানিকটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, চারধারে সব কিছুই নীল......ওপরে আকাশ, নীচে নদীর জলের ধারা, সব নীলে নীল। টুকরো টুকরো সাদা আর ছাই রঙের মেঘের দল নীল আকাশের বুকে, নদীর নীল জলের স্বচ্ছ আর্শিতে ভেসে ভেসে বেড়ায়। আর ওদের ফার স্ট্রীটের ওধারে মাঠে ফসলগুলো কখন এত লম্বা আর ঘন হয়ে বেড়ে উঠলো! শেরিওঝা তো এত দিন তা লক্ষ্য করেনি! কখন ওদের রাই ক্ষেতে শীষ বেরলো সে তো চোখ মেলেও দেখেনি! আশ্চর্য! এখন পথের ওপর দিয়ে চলতে থাকলে রাই শীষগুলো তার মাথায় চোখে মুখে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে জানিয়ে দেয়, ওরা ফুটে উঠেছে, ওরাও আছে। পাখিদের সদ্যজাত বাচ্চাগুলো কখন কোন্ ফাঁকে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। নদীর ওপারে মাঠে হাসছিল যে ফুলের রাশি সেগুলো সংগ্রহের জন্য ঘাস-কাটা যন্ত্রগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের স্কুল বন্ধ হলো। এমনি করে বসন্তের পর গ্রীষ্ম আবার এসে পড়লো। শেরিওঝা বরফ আর তারাদের কথা নিঃশেষে ভুলে গেল।

একদিন কোরোসটিলেভ শেরিওঝাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললো, 'শোন, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা

আছে। আচ্ছা, বলতো বাচ্চা ছেলে, না বাচ্চা মেয়ে, কোন্‌টা আমাদের বাড়ি এলে তোমার ভাল লাগে?'

শেরিওঝা চটপট উত্তর দিল, 'ছোট্ট একটি ছেলে।'

'তুমি ঠিক কথাই বলেছ সোনা। কিন্তু সব দিকই আমাদের ভেবে দেখতে হবে তো। অবশ্য একটি মাত্র ছেলে না থেকে দু'টি ছেলে থাকা অনেক ভাল। কিন্তু আর একটা কথা, আমাদের ছেলে তো একটি রয়েছেই। তাহলে এখন ছোট্ট একটি মেয়েরই প্রয়োজন আমাদের, তাই না?'

শেরিওঝা কোন উৎসাহ না দেখিয়ে শুধু বললো, 'তুমি যা বলবে তাই হবে। ছোট্ট মেয়েই তাহলে ভাল। কিন্তু ছোট্ট একটি ছেলেকে পেলে আমি ওর সঙ্গে বেশ খেলা করতে পারতাম।'

'আর ছোট্ট মেয়েটিকে তুমি দেখাশুনো করবে। দেখবে কোন দুষ্টু ছেলে যেন ওর চুল ধরে না টানে, ওকে না কাঁদায়। তুমি ওর দাদা হবে।'

শেরিওঝা মন্তব্য করলো, 'মেয়েরাও কিন্তু চুল ধরে টানে আর খুব শক্ত করেই টানে। অনেক সময় তো ওরা এমন হেঁচকা টান মারে যে ছেলেরাও কেঁদে ফেলে।' লিডা একদিন তার চুল ধরে কেমন টেনেছিল কোরোসটিলেভকে আজ তা বলে দিতে পারতো। কিন্তু নালিশ করতে সে চায় না।

কোরোসটিলেভ জবাব দিল, 'হাঁ অনেক মেয়েরাও বড্ড দুষ্টু হয় সত্যি। কিন্তু আমাদের মেয়েটি তো একেবারে বাচ্চা হবে কিনা। তাই কারও চুল ধরে ও টানতেই পারবে না।'

শেরিওঝা একমুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে বললো, 'তা হোক... ছোট্ট একটি বাচ্চা ছেলেই আস্থক না। মেয়ের চাইতে ছেলেই কিন্তু ভাল।'

'সত্যি বলছো?'

'হাঁ, ছেলেরা কখনও অপরকে জ্বালাতন করে না। কিন্তু মেয়েরা কেবলই তোমাকে জ্বালাবে দেখো।'

'ও, হাঁ, তা বটে। আচ্ছা, আর এক সময় এই নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, কেমন?'

'আচ্ছা।'

মা একপাশে বসে একমনে কি সেলাই করছে। ওদের কথাবার্তা শুনে মুচকি হাসছে যেন। শেরিওঝা অবাক হয়ে দেখলো মা আজকাল কেমন বিশ্রী রকমের চওড়া পোশাক পড়তে স্থরু করেছে। একথাও অবশ্য সত্যি, মা আজকাল দিনকে দিন বড্ড মোটা হয়ে যাচ্ছে। এখন মা ছোট্ট একটা কি হাতে নিয়ে তার চারধারে লেস বুনে যাচ্ছে। শেরিওঝা এবার মাকে প্রশ্ন করলো, 'কি বানাচ্ছ ওটা?'

'বাচ্চার জন্য টুপি তৈরী করছি। ছোট্ট ছেলে বা ছোট্ট একটি মেয়ে, তোমরা দু'জনে মন স্থির করে যাকে আনবে তারই জন্য তৈরী করছি এটা।'

পুতুলের টুপির মত ক্ষুদে টুপিটার দিকে তাকিয়ে শেরিওঝা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো আবার, 'তার মাথা এত ছোট্ট হবে নাকি?' তারপর মনে মনে সে ভাবতে লাগলো—

কি আশ্চর্য, অত ক্ষুদে মাথা হলে তো চুল ধরে টানলে সমস্ত মাথাটাই উপড়ে চলে আসবে।

মা বললো, ‘প্রথম তো অত ছোট্টই থাকবে, তারপর আস্তে আস্তে বড় হবে। দেখছো তো তিক্টর কেমন একটু একটু করে বড় হচ্ছে! তুমিও তো কেমন বড় হচ্ছো। আমাদের বাচ্চাও তেমনি করে বড় হয়ে উঠবে।’ মা ছোট্ট টুপিটা হাতের ওপর পেতে রেখে দেখতে লাগলো এবার। মার মুখখানি আনন্দে কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কোরোসটিলেভ মার কাছে গিয়ে মায়ের কপালে চক্‌চকে চুলের ডগাটায় আলতো করে চুমো খেল। সত্যি কিন্তু ওরা ছোট্ট একটি ছেলে বা মেয়ে আনবার কথা গভীরভাবেই চিন্তা করছে আজকাল। ছোট্ট একটি বিছানা আর মশারী আনা হলো। বাচ্চা ছেলে বা মেয়েটির জন্য ওরা শেরিওঝার স্নানের টবটিই ব্যবহার করতে পারবে। অনেক দিন আগে সে ওটার মধ্যে বসে হাত-পা ছুঁড়ে মজা করে স্নান করতো। এখন ওটা তার পক্ষে বড্ড ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু এত ছোট মাথাওয়ালা বাচ্চাটা ঐ ছোট টবের মধ্যে বেশ আরামেই স্নান করতে পারবে।

শেরিওঝা জানে লোকে কোথা থেকে বাচ্চা নিয়ে আসে। হাসপাতাল থেকেই ওদের কিনে আনা হয়। হাসপাতালটাই বাচ্চাদের আস্তানা, আর ওখান থেকেই লোকে পছন্দ করে বাচ্চা বাড়িতে নিয়ে আসে। একবার ওদের পড়শী এক মহিলা একটি মেয়ে হাসপাতাল থেকে দু দু’টো বাচ্চা নিয়ে এলো।

একরকম দু'টো বাচ্চা কেন আনলো শেরিওঝা তো ভেবেই অবাক। দু'টো বাচ্চাই আবার হুবহু একই রকম দেখতে। শুধু একটি বাচ্চার ঘাড়ে একটি ছোট তিল ছিল, অন্যটির তা ছিল না। ঐ তিল দেখে তবে ওদের দু'জনকে চিনতে হোত। একেবারে একরকম দু'টো বাচ্চাই কেন আনল, শেরিওঝা ভেবে ভেবে কোন কুলকিনারা পায়নি। দু'টো দুরকম হলে কিন্তু খুব ভাল হোত।

কোরোসটিলেভ আর মা বাচ্চা আনবার সব ব্যবস্থাই করে ফেলেছে বটে, কিন্তু ওরা এত দেরি করছে কেন? বিছানা তো তৈরীই আছে, কিন্তু ঐ বিছানায় শোবে যে বাচ্চা তারই তো দেখা নেই আজ অবধি। শেরিওঝা একদিন মাকে বললো, 'তোমরা হাসপাতালে গিয়ে বাচ্চাটাকে কিনে আনছো না কেন?'

ওর কথা শুনে মা খুব হাসতে সুরু করলো। উঃ! মা কী ভয়ানক মোটা হয়ে গেছে! শেরিওঝা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। মা একটু পরে হাসি চেপে বললো, 'ওখানে এখন কোন বাচ্চা নেই। ওরা বলেছে কয়েকদিনের মধ্যেই আবার বাচ্চা আসবে।'

তা ঠিক, এরকম মাঝে মাঝে ঘটেই থাকে। দোকানে গিয়ে দরকারী একটা জিনিস চাও, দেখবে ঠিক সেটাই তখন দোকানে নেই। আচ্ছা, ওরা তাহলে অপেক্ষাই করবে ধৈর্য ধরে। এমন কিছু তাড়া নেইতো।

কিন্তু মা যাই বলুক না কেন, বাচ্চারা বড্ড আস্তে

আস্তে বড় হয় কিন্তু। ভিক্টরকে দেখেই তা বেশ বোঝা যায়। ভিক্টর তো কতদিন হয়ে গেল এসেছে, কিন্তু এখনও ওর বয়স মাত্র আঠারো মাস! বড়দের সঙ্গে খেলতে পারবে কবে, আরও কতদিন পরে? যে নূতন বাচ্চাটি ওদের বাড়িতে আসবে, সেও তো ভিক্টরের মত অমনি একটু একটু করে বড় হবে। শেরিওঝার সঙ্গে ও খেলতে পারবে কবে কে জানে!

আর যতদিন না বাচ্চাটা বড়সড় হয়ে ওঠে ততদিন শেরিওঝাকেই তো ওকে দেখাশুনো করতে হবে; কাজটা অবশ্য একেবারে মন্দ নয়, বেশ প্রয়োজনীয়ও বটে। কিন্তু কোরোসটিলেভ যতটা ভাল আর সহজ মনে করেছে ঠিক ততটা সহজ আর সুখের নয়। লিডা ভিক্টরকে বড় করে তুলতে বেশ বেগ পাচ্ছে। সারাক্ষণ ওকে কোলে করে কখনও হাসিয়ে কখনও কাঁদিয়ে কখনও শাস্তি দিয়ে ভুলিয়ে রাখা কি সহজ কথা নাকি? কিছুদিন আগে লিডার মা বাবা একটা বিয়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিল আর ভিক্টরকে নিয়ে লিডাকে বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। লিডা সেদিন কেবল কেঁদেছে। ভিক্টরটা না থাকলে তো ও মজা করে মা বাবার সঙ্গে যেতে পারতো। ভিক্টরকে নিয়ে বাড়িতে থাকা যেন ঠিক জেলখানায় বন্দী হয়ে থাকা, লিডা তো তাই বলে।

তাহলে তো ওকেও...আচ্ছা, যাক...ও না হয় কোরোস-টিলেভ আর মাকে এদিক দিয়ে একটু সাহায্যই করবে। ওরা কাজে চলে যাবে, মাসী রান্না করবে আর শেরিওঝা

ঐ অসহায় ছোট্ট পুতুলের মত ক্ষুদে মাথাওয়ালা বাচ্চাটাকে দেখাশুনো করবে। ওকে খেতে দেবে, বিছানায় শুইয়ে দেবে। লিডা আর সে দু'টো বাচ্চাকে নিয়ে একসঙ্গে এক জায়গায় এসে বসবে। দু'জনে মিলে বাচ্চাদের দেখাশুনো করবে। আর বাচ্চা দু'টো ঘুমিয়ে পড়লে ওরা বেশ খেলতেও পারবে।

একদিন সকালবেলা সে ঘুম থেকে উঠলে ওরা বললো, মা নাকি হাসপাতালে বাচ্চা কিনতে গেছে। তার মনটা আনন্দে আর আশায় নেচে উঠলো। আজ সত্যি তার জীবনের একটা বিশেষ দিন, সে ভাবলো। মা তো এক্ষুণি একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে ফিরে আসবে আর সে ছুটে ওদের দিকে এগিয়ে যাবে। তাই সে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে পথের দিকে আকুল আগ্রহে তাকিয়ে রইলো। এমন সময়ে মাসী ওকে ডেকে বললো, 'কোরোসটিলেভ তোমাকে ফোনে ডাকছে।'

শেরিওঝা একছুটে বাড়ির ভিতর গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললো, 'হ্যালো?' ওদিক থেকে কোরোসটিলেভের খুশীভরা স্বর শোনা গেল, 'শেরিওঝা, শোন, তোমার একটি ভাই হয়েছে! শুনছো? ভাই! ভারি সুন্দর নীল দু'টি চোখ ওর, বুঝলে? তুমি খুশী হয়েছ তো?'

'হাঁ...হাঁ!' শেরিওঝা থতমত খেয়ে উত্তর দিল। টেলিফোনটা আর কথা বলছে না।

মাসী চোখ মুছে নিয়ে বললো, 'বাপের মত নীল

চোখ হয়েছে তাহলে! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আজ সত্যি একটা শুভদিন।'

শেরিওঝা এবার প্রশ্ন করলো, 'ওরা এখন বাড়ি আসবে না?'

অবাক হয়ে সে শুনলো এক সপ্তাহ বা তারও বেশী মা আর খোকন নাকি হাসপাতালেই থাকবে এখন। মার কাছে থাকাটা ওকে অভ্যাস করাতে হবে যে। কোরোসটিলেভ প্রতিদিন হাসপাতালে যাতায়াত করছে। কিন্তু তাকে একদিনও নিয়ে যাচ্ছে না। মাকে নাকি এখন সে দেখতে পারবে না। মা ওকে দু'এক কলম লিখে পাঠায়, 'আমাদের খোকন ভারি সুন্দর হয়েছে শেরিওঝা, আর বড্ড চালাক।' মা নাকি ওর ভাল নাম রেখেছে আলেক্সি। এমনিতে ডাকবে লিয়োনিয়া বলে। মা আরও লেখে, ওখানে নাকি তার একটুও ভাল লাগছে না। বাড়িতে চলে আসতে মন চাইছে। ওদের সবার কথা কেবল ভাবছে আর শেরিওঝাকে অনেক আদর পাঠিয়েছে।

এক সপ্তাহ এবং আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল। তারপর একদিন কোরোসটিলেভ বাইরে বের হবার সময় বলে গেল তাকে, 'আমি এক্ষুণি আসছি। তুমি ঠিক হয়ে থাক। তুমি আর আমি আজ তোমার মা আর বাচ্চাটাকে নিয়ে আসবো।'

কিছুক্ষণ পর তোশিয়া মাসীর গাড়ি চেপে কোরোসটিলেভ ফুলের একটা বিরাট তোড়া হাতে ফিরে এলো। ওরা সবাই

সেই গাড়ি চেপে বড়দিদিমা যে হাসপাতালে মারা গিয়েছিল সেখানে এসে উপস্থিত হলো। ফটকের কাছেই প্রথম যে বাড়িটা, ওরা তার সামনে আসতেই হঠাৎ সে মায়ের খুশীভরা স্বর শুনতে পেল, 'মিতিয়া! শেরিওঝা!'

একটা খোলা জানালা দিয়ে মা ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। শেরিওঝাও আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো, 'মা!' মা আবার হাত নেড়ে জানালা থেকে চট করে সরে গেল। কোরোসটিলেভ বললো, 'আর দু'এক মিনিটের মধ্যেই ওরা বেরিয়ে আসবে।'

কিন্তু কোথায় দু' এক মিনিট, মা আসতে এত দেরী করছে কেন? ওরা রাস্তা ধরে পায়চারী করল কতক্ষণ, ক্যাঁচ ক্যাঁচ-করা স্প্রীং-এর দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট একটা গাছের তলায় বেঞ্চে খানিকক্ষণ বসল।

কোরোসটিলেভ এবার অধৈর্য হয়ে পড়ছে আর বলছে, 'তোমার মা আসবার আগে ফুলগুলো সব ঝরেই পড়বে দেখছি।' তোশিয়া মাসী গাড়িটা গেটের বাইরে রেখে এসে বসল ওদের পাশে। তারপর বলল, 'এরকম দেরী হয়েই থাকে।'

একটু পরে বাগানের দরজা খুলে মা বেরিয়ে এলো। মায়ের কোলে দু'হাতে জড়ানো রয়েছে একটা নীল কাপড়ের বাণ্ডিল। ওরা দু'জনে এবার মায়ের দিকে ছুটে গেল। মা বলে উঠলো, 'সাবধান, সাবধান।'

কোরোসটিলেভ মায়ের হাতে ফুলের তোড়াটি দিল আর

মায়ের বুক থেকে সেই নীল বাণ্ডিলটা নিজের বুকে তুলে নিল। এবার বাণ্ডিলটার একদিক থেকে লেসের ঢাকনা তুলে কোরোসটিলেভ শেরিওঝাকে ছোট্ট একখানি গোলাপ ফুলের মত সুন্দর মুখ দেখালো, চোখ দুটি তার বোজা। এই তা হলে লিয়োনিয়া...ওর ভাই...এতক্ষণ চোখ দু'টো ওর ফুলের পাপড়ির মত বোজাই ছিল। এবার পিটপিট করে একটি চোখ একটু খুলতেই নিবিড় নীল চোখের তারা ঝিকমিক করে উঠলো। ছোট মুখখানি কেমন নড়েচড়ে উঠলো। কোরোসটিলেভ কোমল সুরে বললো, 'আঃ! এই যে তুমি জেগেছ!' তারপর ওকে আদরে জড়িয়ে ধরে ওর তুল্‌তুলে গালে চুমু খেল।

মা তীক্ষ্ণ স্বরে ধমকে উঠলো, 'মিতিয়া, একি করছো?'

'কেন? আদর করবো না বুঝি?'

'বাচ্চাদের এমনি করে ক্ষতি হতে পারে জান? হাসপাতালে নার্সরা মুখোশ পরে তবে ওদের কাছে আসে। মিতিয়া লক্ষ্মীটি, আর এমন করে আদর করো না!'

'আচ্ছা, তাই হবে, আর করবো না।'

বাড়ি ফিরে লিয়োনিয়াকে মায়ের বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হোল। মা তখন ওর গায়ের ওপর থেকে সমস্ত ঢাকনা খুলে ফেললো। শেরিওঝা এবার ওকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাচ্ছে। মা কেন বলেছে ও দেখতে ভারী সুন্দর? একে কি সুন্দর বলে নাকি? ওর পেটটা কি রকম ফোলা ফোলা, হাত-পাগুলো তো ছোট ছোট, মানুষের হাত-পা বলে মনেই হয়

না। আর ঐ ক্ষুদে হাত-পা অকারণে ও কেবল নাড়ছেই দেখ। ঘাড় তো দেখাই যায় না। মা আবার বলে, খুব নাকি চালাক ও। কিন্তু চালাকির কোন চিহ্নই নেই কোথাও। দাঁতহীন মুখ হাঁ করে ও এবার ক্ষীণ স্বরে এক ঘেয়ে কাঁদুনি সুরু করলো।

মা ওকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো, 'ও আমার সোনা ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি? এই যে এক্ষুণি তোমাকে খেতে দেব মণি, আর কেঁদ না ধন…'

মা এখন আর সে রকম মোটা নেই কিন্তু। বেশ চটপট করে নড়াচড়া করছে, হেসে জোরে কথা বলছে, কোরোসটিলেভ আর মাসীকে এটা ওটা সেটা করবার জন্য আদেশ করছে। ওরাও তক্ষুণি মায়ের সব হুকুম তামিল করছে।

লিয়োনিয়ার জাঙ্গিয়া ভিজে গেছে। মা এবার ভিজে জাঙ্গিয়া খুলে শুকনো জাঙ্গিয়া পরিয়ে ওকে কোলে নিয়ে নিজের জামার বোতাম খুলে ওর ছোট্ট এক ফোঁটা মুখখানি বুকের মধ্যে চেপে ধরলো। লিয়োনিয়ার একটানা কান্না এবার আচমকা থেমে গেল। মায়ের বুকটা ও কেমন কামড়ে ধরলো দু'টি ছোট্ট ঠোঁট দিয়ে, তারপর লোভীর মত এমনভাবে চুষতে সুরু করলো যেন এক্ষুণি ওর দম আটকে যাবে।

শেরিওঝা মনে মনে ভাবতে লাগলো, উঃ! ক্ষুদে বাচ্চাটা একটা রাক্ষস একেবারে!

শেরিওঝার চোখের দিকে তাকিয়ে কোরোসটিলেভ তার মনের কথা ঠিক বুঝতে পারলো যেন। তাই নরম গলায়

বললো, 'ও তো মাত্র ন'দিনের বাচ্চা। মাত্র ন'দিন ওর বয়স, তাই ওর কাছ থেকে আর কি আশা করতে পার বল ?"

শেরিওঝা লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর দিল, 'না, না, আমি কিছু ভাবছি না তো !'

'কয়েকদিনের মধ্যেই ও কেমন সভ্যভব্য হয়ে উঠবে দেখো।'

তেমনটি ও কবে হবে, শেরিওঝা তো কেবল তাই ভাবছে। কবে সে ওকে একটু কোলে নিতে পারবে ? এরকম জেলির মত নরম আর তুল-তুলে এই ক্ষুদেটার দেখাশুনা করার দায়িত্ব সে কেমন করে নেবে যদি একটু কোলেই না নিতে পারে ? মা-ও তো কত সাবধানে, কত যত্নে কোলে নিচ্ছে ওকে।

লিয়োনিয়া এবার পেট ভরে খেয়ে মায়ের বিছানার একপাশে দিব্যি আরাম করে ঘুমোতে সুরু করলো। বড়রা এবার খাবার ঘরের টেবিলে বসে ওরই কথা কত কি আলোচনা করে চলেছে।

মাসী বললো, 'এখন একটা নার্সের দরকার। আমি একা সবদিক কেমন করে সামলাবো বল ?'

মা বললো, 'না, নার্স দিয়ে কি হবে ? আমি একাই ওর সব কাজ করবো। এখন তো আমার ছুটিই আছে। তারপর না হয় আরও কিছুদিন পর ওকে নার্সারিতে রেখে যাব। ওখানে সত্যিকারের যত্ন হবে।'

শেরিওঝা মায়ের কথা শুনে মনে মনে খুশীই হলো।

মা ঠিকই বলেছে, সেই বেশ ভাল হবে। ওকে নার্সারিতে দেওয়াই ভাল। ভিক্টরকে কেন নার্সারিতে দেওয়া হয় না, লিডা তো রাতদিন তা নিয়ে অভিযোগ করে। শেরিওঝা এবার ওদের বিছানায় উঠে লিয়োনিয়ার পাশটিতে চুপ করে বসলো, ইচ্ছাটা বেশ ভাল করে দেখবে এবার। বাচ্চাটা এখন শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে, হাত-পা নাড়ছে না, কাঁদছেও না। বাঃ সত্যিকারের চোখের পাতা, যদিও খুব ছোট, সবই তো ওর রয়েছে! ওর গায়ের চামড়া কী নরম আর তুলতুলে, যেন মখমল। শেরিওঝা এবার আর ওকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখবার লোভ সামলাতে পারলো না। ওর গায়ে সবে একটু হাতখানি রেখেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে মা ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'কি, হচ্ছে কি শুনি?'

শেরিওঝা ভীষণ চমকে উঠে তক্ষুণি হাতটা সরিয়ে নিল। মা আবার ধমকে উঠলো, 'বিছানা থেকে নেমে এসো দুষ্টু ছেলে! নোংরা হাতে ধরছো কেন ওকে?'

শেরিওঝা বিছানা থেকে সভয়ে নামতে নামতে বললো, 'না, নোংরা নয়তো! পরিষ্কার আছে।'

মা এবার বললো, 'শোন শেরিওঝা, ওকে এখন কিছুদিন তুমি একটুও ধরবে না, কেমন? এখনও তো বড্ড ছোট কিনা। হঠাৎ যদি তুমি ওকে ফেলে দাও? কত কি হতে পারে......আর একটা কথা, তোমার বন্ধুদেরও হঠাৎ করে এঘরে আর নিয়ে এসো না, বুঝলে? ওদের থেকে লিয়োনিয়ার অসুখবিসুখ হতে পারে। এসো, আমরা এবার বাইরে যাই,

—মা একটু যেন আদর ঢেলেই কিন্তু দৃঢ়স্বরে কথাগুলো বললো।

শেরিওঝা মা'র পেছন পেছন চললো। সে আনমনে ভাবছে, এমনটি তো হবার কথা ছিল না। মা আবার ঘরে ঢুকে জানালার ওপর একটা চাদর টাঙিয়ে দিল যাতে রোদের ঝলক এসে বাচ্চাটার গায়ে না লাগে। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

ভাস্কার মামা

ভাস্কার নাকি এক মামা আছে। লিডা অবশ্য ওদের কারও কথাই বিশ্বাস করতে চায় না। কিছু বললেই বলে ওসব বাজে কথা। কিন্তু ভাস্কার মামার ব্যাপারে ও বিশেষ কিছু টীকা-টিপ্পনী করে না। কারণ ভাস্কার মামার একখানি ছবি ওদের বসবার ঘরের হোয়াট্-নটের ওপর দু'টো ফুলদানির মাঝখানটিতে রাখা হয়েছে। ছবিতে একটা পাম গাছের তলায় মামা বসে আছে। তার পরনে সাদা ধব্‌ধবে পোশাক, রোদের কড়া ঝাঁজে ছবিতে মামার মুখ বা পোশাক কিছুই ঠিক বোঝা যায় না। ছবির মধ্যে কেবল পাম গাছটা, আর দু'টো কালো ছায়া, একটা গাছের আর অন্যটা মামার, বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মুখটা দেখা না যাক ক্ষতি নেই কিছু। কিন্তু মামার পোশাকটা কেমন তা যে বোঝা যাচ্ছে না, সেটাই বড় দুঃখের কথা। উনি তো কেবল মামাই নন, উনি যে সমুদ্রগামী

জাহাজের ক্যাপ্টেন একজন। ক্যাপ্টেনরা কেমন পোশাক পরে সেটাই তো দেখবার মত। ভাস্কা বলেছে ওয়াহু দ্বীপের হনলুলুতে নাকি মামার এই ছবিটা তোলা হয়েছে। মাঝে মাঝে ওখান থেকে মামা ওদের কত কি পার্সেল করে পাঠায়। ভাস্কার মা বলবে, 'কোস্তিয়া আমায় এই পঠিয়েছে সেই পাঠিয়েছে।'

জামা-কাপড় ছাড়াও মাঝে মাঝে ভারি সুন্দর সুন্দর মজার জিনিস আসে। যেমন ধর, স্পিরিটের মধ্যে ডোবানো কুমীরের বাচ্চা। মাছের মত ছোট দেখতে, তবুও তো কুমীর! শ খানেক বছর ওটা ঐ স্পিরিটের মধ্যে ঠিক এমনই থাকবে, পচে গলে নষ্ট হবে না। ভাস্কা যে এসব কারণে নিজেকে বেশ কেউকেটা ভাবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? আর সবার যত খেলনা বা শখের জিনিস আছে, ভাস্কার এই কুমীরের বাচ্চাটা তাদের সবগুলোকে হার মানিয়েছে। একবার এক পার্সেলে একটা অপূর্ব সুন্দর উপহার এলো—ইয়া বড় একটা শাঁখ। তার ওপরটা ছাই রঙের, ভেতরটা গোলাপী। গোলাপী ধারটা খোলা বড় ঠোটের মত। ওটার ওপর কান পেতে রাখলে শুনতে পাবে যেন বহু দূর থেকে একটা মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে। মন ভাল থাকলে ভাস্কা মাঝে মাঝে শেরিওঝাকে ওই গুঞ্জন শুনতে দেয়। তখন শেরিওঝা ওটাকে কানের কাছে চেপে ধরে বড় বড় চোখ করে নীরবে রুদ্ধশ্বাসে ওর ভেতর থেকে গুমরে-ওঠা সেই একটানা গুঞ্জন একমনে শুনতে থাকে।

ওটা কিসের গুঞ্জন ? কোথা থেকে ভেসে আসছে ? আর ওটা শুনলেই বা কেন তার মন এত চঞ্চল হয়ে ওঠে ? তার তখন মনে হয় কেবলই সেই একটানা গুঞ্জনটা সে শোনে আর শোনে।

সেই মামাটি, ভাস্কার সেই আশ্চর্য মামাটি হনলুলু এবং আরও দেশ-দেশান্তর দেখে শুনে এখন নাকি ভাস্কাদের সঙ্গে এসে থাকবেন। ভাস্কা একমনে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যেন এটা তেমন একটা বিশেষ কোন খবরই নয়, ঠিক এমনি উদাস স্বরে খবরটা বলে ফেললো একদিন। শুরিক অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 'কোন্ মামা ? সেই ক্যাপ্টেন মামা ?' ভাস্কা উত্তর দিল, 'কোন্ মামা আবার ? উনি ছাড়া আর কোন মামা আমার নেই তো।"

কথাটা এমনভাবে বললো যেন তোমাদের ক্যাপ্টেন মামা ছাড়া অন্য·আজেবাজে মামার দল হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু ও কথা আলাদা। সবাই অবশ্য নীরবে তা স্বীকার করতে বাধ্য হোল। শেরিওঝা প্রশ্ন করলো, 'শীগগিরই আসছেন উনি ?'

ভাস্কা বললো, 'আর দু' এক হপ্তার মধ্যেই এসে যাবেন। আচ্ছা, এখন তাহলে আমি খড়িমাটি কিনতে বাজারে যাচ্ছি।'

'খড়িমাটি দিয়ে কি হবে ?'

'মা ঘরদোর সব চূণকাম করবেন।'

হাঁ, তা সত্যি বটে! অমন মামা এলে ঘরেরও রঙ ফেরাতে হবে বৈকি।

লিডা এবার যেন আর মুখ বুজে থাকতে পারলো না, বলেই ফেললো, 'চাল মারছে কেমন। মামা আসছেন, না, হাতী!' কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই তড়াক করে ও পেছন ফিরে দাঁড়ালো ভাস্কা ওকে মারতে যাবে আশঙ্কায়। কিন্তু ভাস্কা কোন কথাই বললো না। এমন কি 'বোকা' বলেও কোন গালাগাল দিল না। নীরবে ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে লিডাকে যেন একেবারে অগ্রাহ্য করেই ও হাঁটতে সুরু করলো। আর লিডা এবার বোকার মত অপ্রস্তুত হয়ে তাকিয়ে রইলো শুধু।

তারপর ভাস্কাদের বাড়ির রঙ ফেরানো হোল। দেয়ালে নূতন করে কাগজ লাগানো হল। ভাস্কা কাগজে আঠা মাখিয়ে দিত আর তার মা সেগুলো দেয়ালে সেঁটে দিত। ছেলের দল বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো। ভাস্কা ওদের ধমকে বাইরে থাকতে আদেশ করল। বললো, 'খবরদার! ঘরে ঢুকো না যেন। সব নষ্ট করে দেবে।'

ভাস্কার মা ঘরের মেঝে ধুয়ে-মুছে চাঁচ বিছিয়ে দিল এবার। মেঝে পরিষ্কার রাখার জন্য ওরা এখন চাঁচের উপর দিয়েই যাওয়া-আসা করবে। ভাস্কার মা ওদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'নাবিকরা বড্ড পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভালবাসে কিনা।'

এলার্ম ঘড়িটা মামা যে ঘরে শোবে সেখানে টেবিলের ওপর রাখা হোল। ভাস্কার মা আবার বললো, 'নাবিকরা সব কিছু ঘড়ির কাঁটা ধরে করে।'

তারপর ওরা সবাই মিলে ভাস্কার মামার পথ চেয়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। একটা গাড়ি রাস্তার বাঁক ঘুরলেই ওরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভাবতো এই বুঝি স্টেসন থেকে মামা এলেন। কিন্তু যথারীতি গাড়িটা চলে যেত, মামা এলেন না আর লিডা বেশ খুশী হোত। লিডা মেয়েটা অদ্ভুত হিংসুটে কিন্তু। অন্যেরা যাতে আনন্দ পায় তার উল্টোটা হলেই ওর বেশ আনন্দ।

ভাস্কার মা সন্ধ্যেবেলায় কাজ থেকে ফিরে সংসারের কাজ-কর্ম সেরে সামনের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে তার ক্যাপ্টেন-ভাই সম্বন্ধে আলোচনা করতো। বাচ্চারা তার পাশে দাঁড়িয়ে তাই মন দিয়ে শোনে। ভাস্কার মা বললো, 'এখন স্বাস্থ্যের জন্য ও একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে আছে, ওর শরীরটা তেমন ভাল নেই কিনা। বুকের দোষ আছে আবার। সেরা স্যানাটোরিয়ামে ওকে পাঠানো হয়েছিল অবশ্য। চিকিৎসা শেষ হলেই ও এখানে চলে আসবে।'

আর একদিন ভাস্কার মা বললো, 'আমার ভাই খুব সুন্দর গান গাইতে পারত। আমাদের ক্লাবে যে কি সুন্দর গাইত····· কোজলোভস্কির থেকেও ভাল। কিন্তু মোটা হয়ে গিয়ে এখন আর দম রাখতে পারে না বেচারা। তাছাড়া সংসারের নানা ঝামেলায় পড়ে ওসব গান-বাজনা আর আসে না।' তারপর আচমকা স্বরটা খুব নিচু করে বাচ্চারা যাতে শুনতে না পায় সেরকম ফিসফিস করে এবার বলতে লাগলো, '···সব

ক'টিই মেয়ে। বড়টি দেখতে ফর্সা, মেজটি কালো, সেজটির লাল চুল। বড় মেয়েটা কোস্তিয়ার মতই সুশ্রী। ভাই আমার সমুদ্রে গিয়েও কি শান্তিতে থাকতে পারে নাকি? বৌদির কপাল ভাল বলতে হবে, সবই মেয়ে। একটা ছেলেকে মানুষ করে তোলার চেয়ে দশটা মেয়েকে বড় করে তোলা অনেক সহজ।'

পড়শীরা এবার আড়চোখে ভাস্কার দিকে তাকালো। ভাস্কার মাও ভাস্কাকে একপলক দেখে নিয়ে বললো এবার, 'আমার ভাই এবার আমাকে এবিষয়ে একটা বুদ্ধি পরামর্শ দিতে পারবে। ছেলেটাকে কি করে মানুষ করবো ভেবে ভেবে এক এক সময় পাগল হয়ে যাবার যোগাড় হয়।'

ঝেঙ্কার মাসী একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, 'ছেলেরা নিজের পায়ে নিজে না দাঁড়ানো পর্যন্ত ওদের নিয়ে বড়ই মুশকিল।'

পাশা মাসী এবার তার মন্তব্য পেশ করলো, 'তা ছেলেটি কেমন, তার ওপরেই সব নির্ভর করে কিন্তু। আমাদের ছেলেটির কথাই ধরো না। ওতো সত্যি খুব ভাল ছেলে। ওকে নিয়ে কোনদিন ভুগতে হবে না।'

ভাস্কার মা বলে উঠলো, 'ও যে কত ছোট এখনও। ওর কথা আলাদা। ছোটবেলায় সব ছেলেরাই এমন লক্ষ্মী থাকে। একটু বড় হতে না হতেই যত বাঁদরামো সুরু হয়।'

তারপর ক্যাপ্টেন মামা একদিন অনেক রাত্রে এসে পৌঁছলেন। সকাল বেলায় ওরা ঘুম থেকে উঠে ভাস্কাদের

বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখে মামা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, ঠিক ছবির মত সাদা পোশাক পরা—সাদা প্যাণ্ট, সাদা জুতো। পেছনে হাত রেখে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেমন একটু নাকি স্বরে আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন দম টেনে টেনে। মামাকে ওরা বলতে শুনলো, 'বাঃ কী সুন্দর জায়গাটা! চমৎকার! গরমের দেশ থেকে এসে বিশ্রাম নেবার উপযুক্ত জায়গা বটে। পোলিয়া, এমন সুন্দর জায়গায় বাস করছো তুমি? সত্যি, তুমি বেশ সৌভাগ্যবতী।'

ভাস্কার মা উত্তর দিল, 'হাঁ, জায়গাটা মন্দ নয়।'

মামা এদিক ওদিক তাকিয়ে বিস্ময়ভরা স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন এবার, 'বাঃ! এটা কি? এ যে দেখছি পাখির বাসা! বার্চ গাছের ডালে পাখির বাসা! পোলিয়া, তোমার মনে আছে আমাদের স্কুলের পড়ার বইয়ে ঠিক এরকম একটা ছবি ছিল? বার্চ গাছের ডালে পাখির বাসা ঝুলছে!'

ভাস্কার মা বললো, 'হাঁ, মনে আছে। এটা কিন্তু ভাস্কা ওখানে রেখেছে।'

'তাই নাকি? চমৎকার ছেলে তোমার ভাস্কা।'

ভাস্কা সেজেগুজে মা আর মামার একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। ওর সাজসজ্জা দেখে মনে হচ্ছিল আজ যেন 'মে দিবস'।

ভাস্কার মা মামাকে এবার বললো, 'এসো, খাবে এসো।'

মামা বললেন, 'বাইরের এই নির্মল বাতাসটা ভারি ভাল লাগছে। আরও একটু থাকি না এখানে?' কিন্তু

ভাস্কার মা এক রকম জোর করেই তাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে চললো।

মামা তার লম্বা চওড়া দশাসই শরীরখানাকে টেনে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। মামার চেহারাটা কিন্তু বেশ ভালই দেখতে। মুখখানিতে কেমন একটু কোমলতা মাখানো। চিবুকে ভাঁজ পড়েছে। মুখের নীচের দিকটা রোদে পুড়ে বাদামী হয়ে গিয়েছে, কিন্তু উপরের দিকটা ধবধবে ফর্সা। বাদামী রঙটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

ভাস্কা এবার বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। শেরিওঝা আর শুরিক ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে কেবল। ভাস্কা গুরুগম্ভীর স্বরে ওদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এই বাচ্চারা, কি চাও তোমরা?'

ওর কথা শুনে ওরা মুখ বাঁকালো শুধু।

ভাস্কা বলেই চললো, 'জান, মামা আমার জন্য একটা ঘড়ি এনেছেন।' তাই তো, ভাস্কার বাঁ হাতের কব্জিতে একটা ঘড়ি দেখতে পেল ওরা। আর সত্যিকারের ঘড়িই তো ওটা! ভাস্কা ওর হাতখানি কানের কাছে তুলে ধরে ঘড়ির টিক টিক শব্দ শুনলো কয়েক মিনিট। তারপর ঘড়ির চাবিটা কয়েকবার ঘুরিয়ে দিল।

শেরিওঝা এবার বলে উঠলো, 'আমরা ভেতরে যাব?'

ভাস্কা উদার ভঙ্গিতে আদেশের সুরে বললো, 'আচ্ছা, এসো। কিন্তু গোলমাল কোরো না যেন। মামা যখন বিশ্রাম

করবে, সবাই যখন আসবে কথা বলতে তখন কিন্তু চলে যেও। আজ ওদের একটা পরামর্শ সভা বসবে এখানে।'

শেরিওঝা অবাক হয়ে বললো, 'কেন ?'

'আমাকে নিয়ে কি করা, ওরা সবাই মিলে'তাই আলোচনা করবে।'

ভাস্কা এবার বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। ওরা দু' জনে ওকে নীরবে অনুসরণ করলো। ক্যাপ্টেন-মামা যে ঘরে খেতে বসেছেন সেই ঘরের দরজার একপাশে ওরা দু'টিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আর মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখতে লাগলো। ক্যাপ্টেন-মামা এক টুকরো রুটিতে মাখন মাখিয়ে নিলেন। একটা ডিম রাখলেন ডিমের পাত্রে তারপর চামচের মাথা দিয়ে ডিমের মাথাটা আস্তে ভেঙ্গে ছুরির ছুঁচলো মাথা দিয়ে নূনের পাত্র থেকে নূন তুলে নিয়ে সেই ডিমটার ওপরে একটু একটু করে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ এদিক ওদিকে তাকিয়ে তিনি কি যেন খুঁজতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভুরু কুঁচকে উঠলো। একটু কুণ্ঠাজড়ানো স্বরে আস্তে আস্তে বললেন, 'পোলিয়া, একটা ন্যাপকিন দেবে আমায় ?'

ভাস্কার মা ব্যস্তসমস্ত হয়ে পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে তক্ষুণি তার জন্য একখানি পরিষ্কার তোয়ালে নিয়ে এলো। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে মামা তাঁর দু হাঁটুর ওপরে তোয়ালেটা সন্তর্পণে পেতে এবার খাওয়া আরম্ভ করলেন। রুটিটা উনি খুব ছোট ছোট টুকরো করে খাচ্ছেন। ঠিক যেন বোঝাই যাচ্ছে না

তিনি চিবোচ্ছেন কি গিলছেন। ভাস্কার মুখের ভাব এমন হোল দেখে মনে হয় যেন ওর কেউকেটা সভ্যভব্য মামাটি ন্যাপকিন অভাবে খেতে পারছেন না এটাই ওর মস্তবড় গর্ব।

ভাস্কার মা কত রকমারি খাবারই না টেবিলের ওপর রেখেছে। মামা কিন্তু সব রকম খাবার থেকেই একটু একটু করে তুলে মুখে দিচ্ছেন। কিন্তু উনি এত ধীরে চিবোচ্ছেন যে কিছু খাচ্ছেন বলেই মনে হচ্ছে না। ভাস্কার মা কেবলই অভিযোগের সুরে বলছে, 'খাচ্ছ না তো কিছুই। ভাল লাগছে না বুঝি ?'

মামা বললেন, 'চমৎকার সব খাবার করেছো। আমাকে তো মাপা খাবার খেতে হয় কিনা, তাই মনে কষ্ট নিও না বোন।'

মামা ভডকা খেলেন না। বললেন, 'ও আমার খাওয়া বারণ। দিনে একটিবার, ছোট্ট এক গ্লাস ব্রাণ্ডি খেতে পারি শুধু।'

তর্জনী আর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চমৎকার ভঙ্গিতে গ্লাসের ছোট্ট একটা পরিমাণ দেখিয়ে মামা বললেন আবার, 'তাও ঠিক দুপুর বেলা খেতে বসবার আগে খেয়ে নিই যাতে সহজে হজম হয়ে যায়। তার বেশী আমার খাওয়া নিষেধ কিনা।'

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে মামা ভাস্কাকে তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য ডাকলেন। মামা তাঁর সাদা আর সোনালী রঙের টুপিটা মাথায় চাপিয়ে তৈরী হলেন। ভাস্কা

এবার ওদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এবার তোমরা বাড়ি যাও তো।'

মামা বলে উঠলেন, 'ওরাও আমাদের সঙ্গে আসুক না কেন। বাঃ, বেশ সুন্দর ছেলে দু'টি তো! দু'ভাই বুঝি?'

গুরিক বললো, 'না, আমরা ভাই নই।'

ভাস্কাও বললো, 'ওরা তো দু'ভাই নয়।'

মামা বললেন, 'তাই নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম ওরা দু'জনে ভাই না হয়ে যায় না। কোথায় যেন মিল আছে ওদের। একজন কালো, একজন ফর্সা। আচ্ছা, ভাই না হয় নাই হলে! তাতে কি, এসো, তোমরাও এসো বেড়াতে।'

ওদের পথ দিয়ে যাবার সময় লিডা দেখলো। ও হয়তো দৌড়ে ওদের সঙ্গে বেড়াতে আসতো। কিন্তু ভাস্কা আড়চোখে ওর দিকে এমন একটা বাঁকা দৃষ্টি হানলো যে লিডা মুখ ঘুরিয়ে লাফাতে লাফাতে অন্যদিকে চলে গেল।

তারপর ওরা বনের মধ্যে ঢুকলো। মামা তো গাছ-পালা ঝোপঝাড় দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। ক্ষেতের মধ্যে আল-পথ দিয়ে চলতে চলতে চারধারে সোনার ফসল দেখে মামার সে কি স্ফূর্তি! সত্যি কথা বলতে কি, মামার এই উল্লাস দেখে ওরা কিছুটা বিরক্ত হয়ে পড়ছে। মামার কাছ থেকে ওরা যে সাগর আর দ্বীপের গল্প শুনতে চায়।

কিন্তু তবুও মামা ভারী অদ্ভুত ও বিচিত্র লোক! তাঁর বুকের ওপর দোলানো সোনার ব্যাজগুলো রোদের আলোয় কেমন ঝিকমিক করে জ্বলছে! মামার পাশে পাশে ভাস্কা চলেছে। শেরিওঝা আর গুরিক কখনও আগে কখনও বা

তাঁর পেছনে দৌড়ে দৌড়ে চলেছে আর মামার আপাদমস্তক অবাক বিস্ময়ে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখছে। এভাবে ওরা নদীর ধারে এলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মামা এবার বললেন, 'এসো, স্নান করে নেওয়া যাক।'

ভাস্কাও তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞের মত বললো, 'হ্যাঁ, সময় আছে। তাই ভাল।'

তারপর ওরা পরিষ্কার গরম বালির ওপর পোশাক খুলে রাখলো। মামা তাঁর কোটটি খুললে শেরিওঝা আর গুরিক নিরাশ হয়ে দেখলো মামা তাঁর নাবিকের ডোরা কাটা শার্ট না পরে সাধারণ একটা সাদা শার্ট পরে আছেন।

সেই সাদা শার্টটা দু'হাতে তুলে খুলে ফেললে ওরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো। একি ……কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত মামার সর্বাঙ্গে নীল রঙের অদ্ভুত কত কি নক্সা কাটা রয়েছে কেন? মামা সোজা হয়ে দাঁড়ালে ওরা বড় বড় চোখ মেলে দেখলো ওগুলো শুধু আজে বাজে নক্সা নয়, ছবি আর কতগুলো গোটা গোটা অক্ষর।

মামার বুকের ওপর একটা মাছের মত লেজওয়ালা আর লম্বা চুলওয়ালা মৎস্যকন্যার ছবি আঁকা রয়েছে। বাঁ কাঁধের দিক থেকে একটা অক্টোপাস হামাগুঁড়ি দিয়ে যেন মেয়েটির দিকে এগিয়ে আসছে। অক্টোপাসটার ঝাকড়া ঝাঁকড়া ঝুঁটি আর মানুষের মত দু'টো চোখে কী ভয়ানক জ্বলন্ত, হিংস্র দৃষ্টি! মৎস্যকন্যাটি অক্টোপাসের দিকে দু'হাত মেলে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে যেন আকুতি জানাচ্ছে। উঃ! কী সাংঘাতিক ছবি! মামার ডান কাঁধে কি সব লম্বা লম্বা লেখা! কাঁধ থেকে হাতের ওদিকটায় নীল লেখায় লেখায় আর গা দেখা যাচ্ছে না যেন। বাঁ হাতের ওপরটায় দু'টো

পায়রা মুখোমুখি বসে আছে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে আর তাদের মাথার ওপর মালা আর একটা মুকুট এঁকে দেওয়া হয়েছে। হাতের নিচে একটা তীর ধনুকের ছবি আর তারও নীচে বড় বড় অক্ষরে "মুশিয়া" লেখা রয়েছে। শুরিক শেরিওঝার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওঃ! কী চমৎকার বলতো?'

শেরিওঝা একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'হ্যাঁ, ভারী চমৎকার।'

মামা এবার জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতার দিতে সুরু করলেন। পায়ের মৃদু সঞ্চালনে তিনি জলের ওপরে ভেসে রয়েছেন, ভিজা চুলে হাসিমুখে একবার দাঁড়িয়ে নাক ঝাড়লেন। আবার স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে লাগলেন। ওরা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মত মামাকে অনুসরণ করতে লাগলো।

ওঃ! মামা কী চমৎকার সাঁতার কাটছেন! জলের সঙ্গে তাঁর গুরুভার শরীরটাকে নিয়ে একান্ত সহজভাবে খেলা করছেন যেন। পুলের কাছ পর্যন্ত সাঁতরে চলে গেলেন, তারপর চিৎ সাঁতার দিয়ে কতক্ষণ জলের ওপর কেমন হালকা হয়ে ভেসে রইলেন। জলের ভেতরে শুধু তাঁর পা দু'টো একটু একটু করে নড়ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বুকের ওপরকার মৎস্যকন্যাটিও কেমন নড়ছে দেখ! মনে হচ্ছে ও জীবন্ত হয়ে নাচতে সুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর পাড়ে উঠে বালির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে কেমন একটু তৃপ্তির হাসি লেগে রয়েছে। ওরা এবার অবাক হয়ে দেখলো মামার পিঠের ওপর মড়ার মাথা, হাড়, চাঁদ,

তারা, আকাশ কত কি ছবির সমারোহ। মেঘের কোলে লম্বা পোশাক-পরা চোখ বাঁধা অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে বসে আছে······এমনি সব বিচিত্র ছবি তাঁর সারা পিঠে ছড়িয়ে রয়েছে। শুরিক এবার সাহসে ভর করে প্রশ্ন করলো, 'তোমার পিঠে ওসব কি ?'

মামা একটু হেসে উঠে বসলেন এবার। দু'হাত দিয়ে গায়ের বালি ঝেড়ে বললেন, 'যখন আমি খুব ছোট ছিলাম আর বোকা ছিলাম সেসব ফেলে আসা দিনগুলোর কথা এগুলো আমাকে মনে করিয়ে দেয়। দেখছো তো, এক সময় এত বোকা ছিলাম যে সারা শরীরটা এসব ছাইভস্ম ছবি দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এগুলো আর এ জীবনে মুছে যাবে না !'

শুরিক আবার প্রশ্ন করলো, 'ওসব কি লেখা রয়েছে ?'

'তা জেনে আর কি হবে বল ? ওসবের কোন বিশেষ মানে নেই তো। মানুষের অনুভূতি আর কাজই হোল আসল। ভাস্কা কি বল ? তাই না ?'

'হাঁ।'

শেরিওঝা এবার প্রশ্ন করে ফেললো, 'আচ্ছা, সাগর ? সাগরটা দেখতে কেমন ?'

মামা বললেন, 'সাগর ? সাগরের কথা বলছো ? সাগরের কথা আমি আর কি বলবো বল ? সাগর সাগরই। সাগরের মত সুন্দর আর কিছু নেই। তবে কেমন সুন্দর তা বুঝতে হলে নিজ চোখে তাকে দেখতে হয়।'

গুরিক বললো, 'আচ্ছা, সাগরে ঝড় উঠলে তার ভয়ানক রূপ হয় নাকি ?'

মামা আনমনে উত্তর দিলেন এবার, 'সাগরে ঝড়ও ভারী সুন্দর! সাগরে সমস্ত কিছুই সুন্দর… …' মামা সাগর সম্বন্ধে কি একটা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে পায়জামা পরতে লাগলেন।

তারপর বাড়ি ফিরে উনি বিশ্রাম করতে গেলেন আর ওরা ভাস্কাদের গলিতে গিয়ে মামার শরীরের সেই অদ্ভুত উল্কি-গুলোর কথা আলোচনা করতে বসলো।

কালিনিন স্ট্রীটের একটি ছেলে বললো, 'বারুদ দিয়ে ওরা ওসব করে। প্রথমে নক্সাটা এঁকে তার ওপর বারুদ ঘষে দিতে থাকে। আমি একটা বইয়ে পড়েছি।'

আরেকটি ছেলে বললো, 'কিন্তু বারুদ কোথায় পাওয়া যায় বল তো ?'

'দোকানেই পাবে।'

'তোমাকে দিলে তো! ষোল বছরের কম বয়স হলে দোকানে তোমাকে একটা সিগারেটই দেবে না, তা আবার বারুদ!'

'শিকারীদের কাছ থেকে তাহলে আমরা তা পেতে পারি।'

'না, তারাও তোমাকে দেবে না।'

'যদি দেয় ?'

'আর যদি না দেয় ?'

এবার আর একজন বলে উঠলো, 'আগেকার দিনে বারুদ

দিয়ে ওসব করা হোত। এখন সাধারণ নীল কালি বা চাইনীজ ইঙ্ক দিয়েই করা যায়।'

'কালি দিয়ে করলে কি বরাবর থাকবে?'

'হ্যাঁ, থাকবে, চাইনীজ ইঙ্ক দিয়েই বেশীদিন থাকবে।'

শেরিওঝা ওদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে ওয়াহু দ্বীপের হনলুলুর ছবি মনে মনে কল্পনা করবার চেষ্টা করলো। পাম গাছের সারি দিয়ে ঘেরা সোনালী রোদে উজ্জ্বল সেই ছবি! আর সেই পামগাছের তলায় সাদা ধব্‌ধবে পোশাক পরে জাহাজের ক্যাপ্টেনরা ছবি তোলবার জন্য দাঁড়িয়েছে, ও যেন দিব্যদৃষ্টিতে স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছে। একদিন আমিও অমন ভঙ্গিতে ছবি তুলবো, শেরিওঝা ভাবতে থাকে।

ওরা তো বারুদ আর নীল কালির গুণাগুণ নিয়ে আলোচনায় মত্ত হয়ে আছে। আর শেরিওঝা ভাবতে লাগল জগতের সব কিছুই তার সামনে উপস্থিত হয়েছে, হনলুলুতে ক্যাপ্টেন হয়েছে সে—এটা বিশ্বাস করল ঠিক যেমন বিশ্বাস করেছিল কখনও মরবে না সে। সব কিছুই করবার চেষ্টা করবে, সব কিছুই দেখবে এই জীবনে যা কখনও ফুরিয়ে যাবে না।

সন্ধ্যেবেলায় ভাস্কার মামাকে আর একটিবার দেখবার জন্য তার মন বড্ড উতলা হয়ে উঠলো। কিন্তু মামা সেই থেকে কেবল বিশ্রামই করছেন। সারারাত জেগে এসেছেন কিনা। ভাস্কার মা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ব্রাণ্ডি কিনতে যাবার সময় পাশা মাসীকে দেখতে পেয়ে বললো, 'আমার ভাই ব্রাণ্ডি ছাড়া আর কিছু খায় না। তাই ব্রাণ্ডি আনতে যাচ্ছি।'

রাত্রির আঁধার ঘন হয়ে এলো। ভাস্কাদের আত্মীয় পরিজন একজনের পর একজন বেড়াতে আসছে। ঘরে ঘরে বিজলি আলো জ্বলে উঠলো। রাস্তা থেকে জানালার পর্দা ছাড়া ভাস্কাদের বাড়ির ভেতরটার কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। শুরিক এসে শেরিওঝাকে ডাকতেই সে খুব খুশী হোল। শুরিকদের বাগানে একটা লেবুগাছ আছে। সেটার ওপর উঠলে ভাস্কাদের বাড়ির ভেতরটা নাকি সব দেখা যাবে। শেরিওঝাকে সঙ্গে করে যেতে যেতে শুরিক বললো, 'জান, উনি ঘুম থেকে উঠেই ব্যায়াম করেন। তারপর গোঁফ দাঁড়ি কামিয়ে একটা স্প্রে দিয়ে কি একটা সুগন্ধী সমস্ত গায়ে ছড়িয়ে দেন। তাদের এখন খাওয়া হয়ে গিয়েছে......এসো, এই গলিটা দিয়ে যাই। না হয় লিডা আবার দেখতে পেয়ে পিছু নেবে।'

তিমোখিনের তরকারী বাগান আর ভাস্কার বাগানকে আলাদা করে বুড়ো লেবুগাছটা বেড়ার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে। ভাস্কাদের বাড়ির একেবারে গা ঘেষেই এই বেড়াটা, কিন্তু বেড়ার কাঠ এত পচা যে ওরা তাতে ওঠবার চেষ্টা করলেই তা মড়মড় করে ভেঙ্গে যাবে। লেবুগাছটায় একটা গর্ত আছে, একটা হুপু পাখি গরমকালে সেখানটায় বাসা বেঁধেছিল। আর আজকাল শুরিক বড়দের চোখে ধুলো দিয়ে কার্তুজের বাক্স, আতশী কাঁচ আরও কত কি টুকিটাকি জিনিস এই গর্তের গহ্বরে লুকিয়ে রাখে। আতশী কাঁচটা দিয়ে ও প্রায়ই গাছের গা বা বেড়ার গা পুড়িয়ে দিয়ে মজা দেখে। ওরা

দু’জনে এবার লেবুগাছটার খস্‌খসে গা বেয়ে একটা বাঁকা ডালের ওপর উঠে বসলো। শুরিক গাছের গুঁড়িটা দু’হাতে শক্ত করে ধরে আর শেরিওঝা শুরিককে জড়িয়ে ধরে বসলো।

গাছের সবুজ সতেজ নরম ফুর্‌ফুরে ঝিরিঝিরি পাতাগুলো ওদের মাথার ওপরে দুলছে। সূয্যিমামা কখন ডুবে গেছে, তবু তারই সোনালী আভায় উপর দিকটা এখনও কেমন রাঙা হয়ে আছে আর গাছের নীচে সন্ধ্যার আঁধার ঘন হয়ে জমাট বেঁধেছে যেন। শেরিওঝার চোখের সামনে একটা ডাল ওর সব্‌জে কালো পাতাগুলো নিয়ে অনবরত দুলছে। ভাস্কাদের বাড়ির ভেতরটা সবই বেশ দেখা যাচ্ছে কিন্তু। ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। পরিবারের সবার মাঝখানে মধ্যমণি হয়ে ক্যাপ্টেন মামা বসে আছেন। শেরিওঝা এখান থেকেই ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

ভাস্কার মা দু’হাত নেড়ে বলছে, ‘রাস্তায় ওর সেই অপকর্মের জন্য ওরা আমার কাছ থেকে পঁচিশ টাকা জরিমানা নিয়ে তবে ছাড়লো।’

একজন ভদ্রমহিলা হেসে উঠলে ভাস্কার মা বিরক্তি ভরা সুরে বললো, ‘এতে হাসবার কিছু নেই তো! আবার মাস দুয়েক পর সিনেমা হলের শো-কেস ভাঙ্গার জন্য আমাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হোল।’

একজন মহিলা বললো, ‘বড়দের সঙ্গেও ও প্রায়ই মারামারি করে শুনতে পাই। সিগারেটের আগুন দিয়ে লেপ পুড়িয়ে একবার তো বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল আর কি।’

ক্যাপ্টেন মামা এবার বলছেন, 'সিগারেট কেনবার পয়সা ও পায় কোথা থেকে ?'

ভাস্কা দু' হাঁটুর মধ্যে মুখটি গুঁজে চুপচাপ বসে আছে। মামা ওর দিকে তাকিয়ে নরম সুরে বললেন, 'এই দুষ্টু ছেলে, বল, কোথা থেকে সিগারেট কিনবার পয়সা পাও তুমি ?'

ভাস্কা এবার নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দিল, 'কেন, মা দেয়।'

মামা ভাস্কার মার দিকে চেয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার পোলিয়া ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ভাস্কার মা কাঁদতে সুরু করলো। মামা আবার ভাস্কাকে বললেন, 'আচ্ছা তোমার স্কুলের রিপোর্ট বইটা আন তো দেখি।'

ভাস্কা উঠে গিয়ে একটা খাতা এনে মামার হাতে দিল। পাতার পর পাতা উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে মামার ভুরু দু'টো বিরক্তিতে কুঁচকে উঠলো। তারপর নীচু স্বরে বললেন, 'পাজী ছেলে! একেবারেই তো অকর্মার ধাড়ী দেখছি।'

তারপর রিপোর্ট বইটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে পকেট থেকে রুমাল বের করে রুমালটা দুলিয়ে নিজেকে হাওয়া করতে সুরু করলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলতে লাগলেন, 'হাঁ, সত্যি ছেলেটা একেবারেই বয়ে গেছে দেখছি। যদি ওর ভাল করতে চাও তাহলে তোমাকে শক্ত হতে হবে পোলিয়া। ওকে কড়া শাসন করতে হবে। আমার নিনার কথাই ধর না কেন। আমাদের মেয়েগুলোকে'ও চমৎকারভাবে

শিক্ষা দিয়েছে। ওরা কত বাধ্য, কেমন সুন্দর পিয়ানো বাজনা শেখে। আর তার একমাত্র কারণ হোল নিনা ওদের ওপর কড়া নজর রাখে।'

সবাই এবার সমস্বরে বলে উঠলো, 'মেয়েদের কথা আলাদা। ছেলেদের চাইতে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অনেক সহজ।'

লেপের গল্পটা যে বলেছিল সেই মহিলা মামার দিকে তাকিয়ে বললো এবার, 'জান কোস্তিয়া, ওর মা যদি ওকে পয়সা না দেয় তাহলে না বলে মায়ের ব্যাগ থেকে সে পয়সা নেয়।'

ভাস্কার মা এবার আরও জোরে কাঁদতে লাগলো।

ভাস্কা বললো, 'মার ব্যাগ থেকে পয়সা নেব না তো কার ব্যাগ থেকে নেব? অন্যের ব্যাগ থেকে?'

মামা এবার বেদম রেগে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'যাও, বেরিয়ে যাও চোখের সাম্‌নে থেকে।'

এদিকে শুরিক ফিস ফিস করে শেরিওঝাকে বললো, 'দেখ, দেখ, ওকে এখন মামা মারবেন নিশ্চয়ই।'

ওরা যে ডালটিতে বসেছিল মড়মড় শব্দ করে সেই ডালটা ভেঙ্গে পড়লো এবার। শেরিওঝা আর শুরিক জড়াজড়ি করে হুমড়ি খেয়ে মাটির ওপর আছড়ে পড়লো। শুরিক মাটিতে শুয়ে থেকেই বলে উঠলো, 'এই, কেঁদো না যেন!'

তারপর দু' জনে উঠে বসে গায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগলো। ডাল ভেঙ্গে পড়ার হুড়মুড় শব্দে ভাস্কা এদিকে তাকিয়ে ওদের

দেখতে পেয়ে ব্যাপারটা সব বুঝতে পারলো। সে বললো, ‘দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি তোমাদের।’

এবার জানালার আলোতে দেখা গেল একটা সাদা ছায়া ভাস্কার পেছনে আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে বললো, ‘দেখি সিগারেট গুলো আমায় দাও তো বোকা ছেলে।’

শেরিওঝা আর গুরিক খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাগান ছেড়ে পালাবার সময় পেছন ফিরে দেখতে পেল ভাস্কা তার মামার হাতে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে দিল আর মামা সেটাকে ছিঁড়ে গুঁড়ো করে ফেলে দিয়ে ভাস্কাকে টুঁটি ধরে টেনে হিঁচড়ে ঘরের মধ্যে নিয়ে চলেছে।

পরদিন সকালবেলা ভাস্কাদের বাড়ির দরজায় তালা ঝুলতে দেখা গেল। লিডা বললো ওরা সবাই ভোর হতেই খালভ যৌথ খামারে কোন আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছে। সারাদিন কেউ ফিরলো না। পরদিন সকাল বেলা ভাস্কার মা একা ফিরলো। কাঁদতে কাঁদতে দরজায় আবার তালা লাগিয়ে কাজে বেরিয়ে গেল। ভাস্কা সে রাত্রেই ওর মামার সঙ্গে চলে গেছে আর ফিরবে না। মামা ওকে মানুষ করবার জন্য নাখিমোভ নৌ-স্কুলে ভর্তি করে দেবে। মায়ের ব্যাগ থেকে না বলে পয়সা নিয়ে আর সিনেমার শো-কেস ভেঙ্গে দিয়ে ভাস্কার কেমন লাভ হয়ে গেল!

মাসীর সঙ্গে দেখা হলে ভাস্কার মা বললো, ‘ঐ সব আত্মীয়স্বজনই যত নষ্টের গোড়া। ওরা সেদিন ভাস্কার বিরুদ্ধে এমনভাবে কথা বলেছে যেন ও একটা পাকা বদমাস

হয়ে গেছে। আসলে ও আমার সত্যিই তো আর এত খারাপ ছেলে নয়। একটু আধটু দুষ্টুমি করে শুধু। আমাকে তো কত সময় কত সাহায্যও করেছে। পাঁজা পাঁজা কাঠ কেটে আনত। বাড়ির দেওয়ালে কাগজ সাঁটবার সময় ও আমাকে সাহায্য না করলে আমি একা কি করতে পারতাম? আর এখন ছেলেটা আমার একেলা কোথায় পড়ে রইলো! আমাকে ছেড়ে বেচারী কি করছে, কেমন আছে কে জানে?' ভাস্কার মা নাকি সুরে কাঁদতে সুরু করলো আবার। কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগলো, 'ওদের ছেলে তো নয়, তাই ওদের আর কি? শরৎকালে গলায় ফোড়া হবেই, কে আর তখন ওকে দেখাশুনো করবে, যত্নআত্তি করবে?'

তারপর থেকে টুপি মাথায় কোন ছেলেকে দেখলেই ভাস্কার মা কাঁদতে সুরু করে। শেরিওঝা আর শুরিককে ডেকে ডেকে ভাস্কার কত গল্প বলে, ভাস্কার ছেলেবেলার ছবি দেখায়। মামা তাকে যে সমস্ত ছবিগুলো দিয়েছে সেগুলোও ওদের দেখতে দেয়। সাগর-পারের কত বন্দর, কলাবাগান, পুরনো প্রাসাদোপম কত বাড়ি, জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়ানো কত নাবিক, হাতীর পিঠে আরোহী, সাগরের ঢেউ কেটে কেটে চলা মোটর বোট, মলপরা কালো নাচনেওয়ালী; পুরু ঠোঁট আর কোঁকড়ানো চুলওয়ালা কালো কালো ছেলেমেয়ের দল··· এমনি কত রকমারি ছবি ওরা দু' চোখ ভরে দেখে আর অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। প্রতিটি ছবিই কী সুন্দর আর বিচিত্র! প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতেই সাগরকে দেখতে পাবে.

তুমি, অসীম সেই নীল সাগর নীল আকাশের কোলে এক হয়ে মিশে গেছে। সাগরের ছোট ছোট ঢেউগুলো আনন্দে নাচছে আর মাতামাতি করছে ফেনা নিয়ে। সাদা সাদা ফেনাগুলো ঝিকমিক করছে মণিমুক্তোর মত, গোলাপী রঙের সেই শাঁখটায় কান পাতলে একটানা যে মধুর সুরগুঞ্জন শোনা যায়, অপরূপ রূপকথার দেশ থেকে তেমনি মৃদু ঘুমপাড়ানী গান ভেসে আসছে যেন।

কিন্তু ভাস্কার বাগান এখন একেবারে শূন্য, নীরব। রাজাহীন রাজত্ব যেন। যে কেউ এখন এখানে গিয়ে সারাটা দিন খেলা করুক না, কেউ কিছু বলবার নেই, কেউ তাড়িয়ে দেবার নেই। বাগানের মালিক আজ কতদূরে সেই অজানা রূপকথার রাজ্যে চলে গেছে...শেরিওঝাও একদিন যাবে, নিশ্চয়ই যাবে!

মাতুলদর্শনের খেসারত

কালিনিন স্ট্রীট আর ফার স্ট্রীটের মধ্যে একটা গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠলো। গোপনে কথাবার্তা চলতে লাগলো। শুরিক ওদিকে যাতায়াত সুরু করেছে আর সর্বদাই ব্যস্ত ভাব, শেরিওঝাকে সব. খবরাখবর এনে দিচ্ছে। রোদে পোড়া মোটাসোটা দু'টি পা ক্ষিপ্র গতিতে চালিয়ে ওর কালো কালো দু'টি চোখের দৃষ্টি চারদিকে চকিত দৃষ্টি হানছে। একটা নূতন বুদ্ধি মাথায় ঢুকলেই শুরিকের চোখ দু'টো কেবল ডাইনে বাঁয়ে সচকিত দৃষ্টি ফেলবে আর ঠিক তখনই ওর বাবা তিমোখিন ও

মা বুঝতে পারবে ছেলের মাথায় আবার কোন দুষ্ট অভিসন্ধি ঢুকেছে। মা ভাবনায় পড়ে, বাবা চাবুক মারবার ভয় দেখায়। শুরিকের ভাবধারাগুলো বরাবরই ক্ষতিকারক কিনা। তাই ওর জন্য ওর বাবা-মার বড় দুশ্চিন্তা। তাদের সবেধন নীলমণি ছেলেটাকে তারা সুস্থ সবল দেখতে চায়, বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

কিন্তু শুরিক কি আর ওসব গ্রাহ্য করে নাকি? কালিনিন স্ট্রীটের ছেলেরা উল্কি ফোটাবে আর এ সময় চাবুকের ভয় পায় কে? গোপনে গোপনে ওরা দু'দল ছেলে এজন্য সমস্ত ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করে চললো। শুরিক আর শেরিওঝার কাছ থেকেই ওরা ভাস্কার মামার উল্কির বিষয়ে খুঁটিনাটি সব কথা জেনে নিয়েছে। শরীরের কোথায় কোথায় কেমন সব ছবি, সব কথা জেনে ওরা প্রথমে ছবির নক্সা এঁকে নিল তারপর শুরিক আর শেরিওঝাকে এসবের মধ্যে আর রাখতে চাইলো না। তাই ওদের বললো, 'তোমাদের মত বাচ্চাদের জন্য এসব নয়, বুঝলে?' উঃ! কী ধড়িবাজ ছেলে ওরা। এটা অত্যন্ত অন্যায়।

কিন্তু ওরাই বা কি করবে বল? কাউকে তো একথা বলেও দিতে পারে না। তাছাড়া, জগতের কাউকে অর্থাৎ কিনা ফার স্ট্রীটের কাউকে এবিষয়ে কিছু বলবে না ওরা, এই প্রতিজ্ঞাও সে করে ফেলেছে। কারণ ফার স্ট্রীটেই সেই বিখ্যাত মুখরা মেয়ে লিডা রয়েছে, যার পেটে কোন কথা থাকবে না, চারধারে রসাল করে বলে বলে বেড়াবে। লিডা.

শুনলেই বড়দের কানে কথাটা যাবে আর তারপর যে কি হবে তা না ভাবাই ভাল। স্কুলে খবরটা রটে গেলে মাস্টারমশায়দের সভা, বাবা-মাদের জরুরী সভা, সব জায়গায় হাজির হতে হতে প্রাণান্ত করবে। হৈ হৈ স্বুরু হবে আর চারদিক থেকে একটা গোলমালের সৃষ্টি হবে। তাই কালিনিন স্ট্রীটের ছেলেরা ফার স্ট্রীটের ছেলেদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চাইলো না। কিন্তু শুরিককে তাড়িয়ে দেওয়া অত সহজ নয়। ও ওদের আঁকা ছবিগুলো সব দেখেছে। শুরিক শেরিওঝাকে বললো, 'ওরা অনেকগুলো নূতন ছবিও এঁকেছে। এরোপ্লেন, পাহাড়, ঝরনা এঁকেছে। আবার কতগুলো উপদেশ বাণীও লিখে নিয়েছে। আঁকা সেই কাগজের টুকরো তোমার গায়ের ওপর রেখে একটা পিন দিয়ে আঁকার উপর ফুটিয়ে ফুটিয়ে গেলেই ছবিগুলো তোমার গায়ে চমৎকার ফুটে উঠবে।'

শুরিকের কথায় শেরিওঝা চমকে উঠলো। পিন দিয়ে ফোটাবে? পিন!

কিন্তু শুরিক যদি পিন ফোটানো সহ্য করতে পারে তাহলে সে পারবে না কেন? তাকেও সহ্য করতেই হবে। তাই কিছু যেন হয়নি এমনি নির্ভীক ভাব দেখিয়ে সে বললো, 'হাঁ, চমৎকার হবে কিন্তু।'

কিন্তু কালিনিন ষ্ট্রীটের ওস্তাদ ছেলেরা ওদের দু'জনকে উল্কি দিতে কিছুতেই রাজি হোল না। ওরা কত কাকুতি মিনতি করলো, কিন্তু ওদের কথা কে শোনে? শুধু বললো, 'বিরক্ত করো না। তোমরা তো ছেলেমানুষ, এসব দিয়ে কি

হবে? যাও, বাড়ি যাও।' ওরা দু'জনকেই ধমকে তাড়িয়ে দিল।

ওরা এবার একেবারেই মুস্‌ড়ে পড়লো। আর বুঝি কোন আশাই নেই। শুরিক মরিয়া হয়ে অনেক চেষ্টার পর ওদের দলের আরসেন্টিকে ওর পক্ষে টানলো।

আরসেন্টি সব বাপ মায়ের কাছেই বড় আদর্শ ছেলে। পড়াশোনায় বেশ ভাল, ক্লাসে সব চেয়ে বেশী নম্বর পায়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। সবাই ওকে ভালবাসে। ওর সব চেয়ে বড় গুণ সে ন্যায় অন্যায় ভালমন্দ বেশ বুঝতে পারে।

খানিকটা হাসি ঠাট্টার পর ওদের দুজনকে দলের কাছে নিয়ে গিয়ে আরসেন্টি বললো, 'ওদেরও তো একটা দাবী আছে। ওদের হাতে এক একটা অক্ষর অর্থাৎ ওদের নামের প্রথম অক্ষরটি লিখে দাও। তুমি কি বল শুরিক?'

শুরিক বললো, 'না, শুধু একটা অক্ষর হলে চলবে না।'

পঞ্চম শ্রেণীর শক্তসমর্থ ভ্যালেরি বলে উঠলো, 'তাহলে ভাগো এখান থেকে। একটা অক্ষর কেন, কিছুই লিখে দেওয়া হবে না তোমাদের হাতে।'

শুরিক রাগ করে চলে গেল কিন্তু একটু পরেই আবার ফিরে এসে বললো, 'আচ্ছা, একটা অক্ষরেই আমরা রাজী আছি। অক্ষরটা বেশ সুন্দর করে আধুনিক পদ্ধতিতে লিখে দিতে হবে কিন্তু। যাচ্ছেতাই করে লিখলে কিন্তু চলবে না।'

ঠিক হোল ভ্যালেরির বাড়িতে পরের দিন ব্যাপারটা হবে কারণ ভ্যালেরির মা বাড়িতে নেই।

শুরিক আর শেরিওঝা ওদের কথামত পরের দিন ভ্যালেরির বাড়িতে এলো। ভ্যালেরির বোন লারিস্কা সেলাই হাতে দরজার সামনে বসেছিল। কেউ এলে 'বাড়িতে কেউ নেই' বলার জন্যই লারিস্কা এভাবে বসেছে। ওদের স্নানঘরের পাশে একফালি উঠানে ছেলের দল জমায়েত হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণী, এমন কি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছেলেরাও আছে। গোমড়ামুখো ফর্সা বলিষ্ঠ একটি মেয়েও ওদের মধ্যে আছে। ওর নীচের ঠোঁটটা কেমন যেন বিবর্ণ, পুরু আর একটু বৈশিষ্ট্য মাখানো। অনেকে বলে ঐ ঠোঁটের জন্যই নাকি ওকে বেশ ভারিক্কী মনে হয়। মেয়েটির নাম কাপা। ও একটা কাঁচি নিয়ে ব্যাণ্ডেজ কেটে কেটে টুলের ওপর রাখছে। কাপা নাকি ওদের স্কুলের স্বাস্থ্য কমিটির একজন সভ্যা। ও টুলের ওপর একটা ধব্‌ধবে সাদা কাপড় পেতে পরিপাটি করে সব ব্যবস্থা করে রাখছে।

ছোট্ট স্নান-ঘরটির দরজার ওদিকে একটা বেঞ্চের ওপর সেই রকমারি ছবিগুলো রাখা হয়েছে। ছেলেরা সেই ছবিগুলো একে একে দেখছে, কে কোন্‌টা নেবে ঠিক করছে। ঝগড়া করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ একটা ছবি যতবার খুশি ব্যবহার করা যাবে। শুরিক আর শেরিওঝা দূর থেকেই ছবিগুলো দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। ইচ্ছে হলেও কাছে গিয়ে ওগুলো ধরতে পারছে না, কেন না ঐ ছেলেরা ওদের চাইতে কত বড়, আর ওদের গায়ের জোরও অনেক বেশী।

আরসেন্টি স্কুল থেকে বই-এর থলে হাতে নিয়েই বরাবর

এখানে চলে এসেছে। বাড়ি ফিরেই ওকে রচনা লিখতে হবে, ভুগোল পড়া শিখতে হবে বলে ওকে সবার আগে ছেড়ে দেবার জন্য বললো ও। পড়ার আগ্রহ দেখে অন্যরা তাতে রাজি হোল। আরসেন্টি এবার থলেটা রেখে দিয়ে একটু হেসে বেঞ্চের ওপর বসে শার্ট উঠিয়ে পিঠ খালি করে দিল। বড় ছেলেরা সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে শেরিওঝা আর শুরিককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। এত পেছন থেকে অনেক লাফ ঝাঁপ মেরেও ওরা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ছেলেরা এতক্ষণ বকবক করছিল। এবার ওদের কথা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসছে। কেমন একটা নীরব থমথমে ভাব। শুধু কাগজের খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ভ্যালেরির গলা শোনা গেল। ভ্যালেরি বলছে, 'কাপা, লারিস্কার কাছ থেকে একটা পরিষ্কার তোয়ালে চেয়ে নিয়ে এসো তো।'

কাপা ছুটে গিয়ে তক্ষুণি একটা তোয়ালে নিয়ে এসে সবার মাথার ওপর দিয়ে ভ্যালেরির দিকে ছুঁড়ে দিল।

শেরিওঝা এবার একটু লাফিয়ে ওদিকে কিছু দেখবার চেষ্টা করে শুরিককে প্রশ্ন করলো, 'তোয়ালে দিয়ে কি করবে ওরা ?'

সামনের দু' একটি ছেলের মধ্য দিয়ে- মাথা গলিয়ে একটু দেখবার আপ্রাণ চেষ্টা করে, শুরিক বললো, 'হয়তো রক্ত ঝরছে, তাই।' একটা লম্বা ছেলে কঠিন দৃষ্টিতে শুরিকের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠলো, 'এই দুষ্টুমি করো না।

তারপর আবার সব চুপচাপ। কি হচ্ছে, কি করছে ওরা,

কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এই অসহ্য নীরবতার যেন শেষ হবে না আজ। শেরিওঝা এবার যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর ভাল লাগছে না ওর···বাইরে গিয়ে একটা ফড়িং ধরল, ভ্যালেরিদের উঠানের দিকে, লারিস্কার দিকে চেয়ে রইল। যাক····শেষ পর্যন্ত ওরা কথা বলতে স্নুরু করলো। একটু পরেই ভিড় ঠেলে আরসেন্টি এদিকে এগিয়ে এলো।

উঃ! এ আবার কি? ওকে যে চেনাই যাচ্ছে না! কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত বেগুনি হয়ে গেছে আর কী ভয়ানক দেখাচ্ছে। ওর সাদা বুক, সাদা ধবধবে পিঠ সব কোথায় গেল? ওর কোমর সেই তোয়ালেটা দিয়ে জড়ানো রয়েছে। তোয়ালেটার জায়গায় জায়গায় কালি আর রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে কেন? আর ওকে কী অদ্ভুত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে! তবুও মৃদু হাসছে। সত্যি আরসেন্টি একজন মস্ত বড় বীর! ও এবার কাপার কাছে হেঁটে এসে তোয়ালেটা খুলে ফেলে বললো, 'শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও।'

কে একজন বলে উঠলো, 'এই বাচ্ছা দু'টোকে আগে দিয়ে দিই, না হলে ওদের নিয়ে বিপদে পড়তে হবে।'

ভ্যালেরি এবার এগিয়ে এসে ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কোথায বাচ্ছারা? কিগো, তোমরা মত বদলাওনি তো? আচ্ছা, তাড়াতাড়ি এসো তাহলে।'

কেমন করেই বা মত বদলানো যায়? আরসেন্টি রক্তাক্ত আর কালিমাখা হয়েও কেমন হাসছে, তা দেখেও কি পিছু হটা যায়? শেরিওঝা ভাবলো, একটা তো মাত্র অক্ষর; তেমন

সময় লাগবে না নিশ্চয়ই। শুরিকের সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে গেল। বড় ছেলেরা সবাই আরসেন্টিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কাপার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ভ্যালেরি বেঞ্চে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

শুরিক তাকে প্রশ্ন করলো, 'আমারও কি তোয়ালে লাগবে নাকি?'

'না, তোয়ালে ছাড়াই তোমার চলবে। দেখি, হাতটা এগিয়ে দাও তো।' শুরিকের হাতটা টেনে নিয়ে ভ্যালেরি একটা পিন দিয়ে ফোটাতে সুরু করলো।

'উঃ!'...

'যদি উঃ কর তাহলে করব না, চলে যাও', ভ্যালেরি ধমকে উঠে আবার পিন ফোটাতে ফোটাতে বললো, 'মনে কর একটা কাঁটা বের করে দিচ্ছি। তাহলে আর ব্যথা লাগবে না।'

শুরিক দাঁতে দাঁত চেপে বিকৃত মুখভঙ্গি করতে লাগলো, কিন্তু মুখ দিয়ে আর টুঁ শব্দটি বের হোল না। মাঝে মাঝে কেবল অস্থিরভাবে লাফাতে লাগলো আর হাতের ওপর ফুঁ দিতে লাগলো। শুরিকের হাতের ওপর একটার পর একটা গোলাপী ফুটকি ফুটে উঠতে লাগলো কেমন। ভ্যালেরি হাতটা আরও শক্ত করে জাপটে ধরে পিনের ছুঁচলো মুখ দিয়ে ফুটকিগুলোকে আরও টেনে দিল। শুরিক নিঃশব্দে লাফিয়ে উঠলো আর প্রাণপণে হাতের ওপর ফুঁ দিয়ে চললো। লাল রক্তের ধারা একটু একটু করে সেই ফুটকিগুলো দিয়ে গড়িয়ে

পড়ছে এবার।...উঃ! শুরিক কী সাহসী! বিবর্ণ শেরিওঝা অবাক হয়ে ভাবছে, শুরিক তো একটুও কাতরাচ্ছে না! আমিও উঃ-আঃ কিছু করবো না। হায়, হায়, আমার আর পালাবার উপায় নেই। ওরা যে হাসবে, ঠাট্টা করবে আর শুরিকও আমাকে ভীরু বলবে।

ভ্যালেরি এবার টেবিলের ওপর থেকে একটা কালির শিশি নিয়ে তাতে তুলি ডুবিয়ে সেই রক্তাক্ত ফুটকিগুলোর ওপর কালির তুলিটা বুলিয়ে দিতে লাগলো। একটু পরে বললো, 'যাও, হয়ে গেছে। এবার কে আসবে?'

শেরিওঝা বীরের মত পা ফেলে এগিয়ে এসে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

গ্রীষ্মের শেষে এ ব্যাপারটা ঘটেছিল। তখন সবে স্কুল খুলেছে। সূর্য্যালোকে দিনগুলো তখন ছিল উষ্ণ। এখন হেমন্ত। নীল আকাশ একটু একটু করে কেমন ঘোলাটে হয়ে এসেছে। শীতের হাওয়া কোন ফাঁক দিয়ে যাতে ঘরে ঢুকতে না পারে সেজন্য মাসী জানালার ফুটোগুলোতে পর্যন্ত কাগজ সেঁটে দিল।

শেরিওঝা বিছানায় শুয়ে আছে। বিছানার পাশে দু'টি চেয়ার। একটিতে একগাদা খেলনা আর একটিতে বসে খেলনা দিয়ে মাঝে মাঝে খেলা করে সে। কিন্তু চেয়ারে বসে বসে কি খেলা যায় নাকি? ট্যাঙ্কগুলো কোথা দিয়ে ঘুরবে, শত্রুপক্ষের পেছন ফেরার জায়গা নেই,

চেয়ারের পেছন পর্যন্ত গিয়েই তো থেমে যাবে। ঐ পর্যন্তই সীমানা যে! আর সেখানেই যুদ্ধেরও শেষ।

ভ্যালেরিদের বাড়ি থেকে সেদিন বের হয়ে আসার পর থেকেই শেরিওঝার অসুখ সুরু হোল। কালি-মাখা বাঁ হাতখানি ফুলে গেছে, ভীষণ জ্বালা করছে; আলোতে বেরিয়ে আসতেই চোখে অন্ধকার দেখলো। আর, সিগারেটের ধোঁয়া নাকে ঢুকতেই বমি করল খানিকটা। বাইরে ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো এবার। বাঁ হাতে অসহ্য জ্বালা ও যন্ত্রণা। শুরিক আর অন্য একটি ছেলে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিল। লম্বা-হাতা শার্ট পরা ছিল বলে মাসী প্রথমে কিছু লক্ষ্য করেনি। কোন কথা না বলে ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লো সে।

তারপর বমির সঙ্গে বেদম জ্বর এলো। মাসী ভয় পেয়ে স্কুলে মাকে ফোন করলো। মা তক্ষুণি এসে ডাক্তারকে ডেকে পাঠালো। তারপর জামা প্যাণ্ট বদলে ওর হাতের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে হাতটা দেখে ওরা আঁতকে উঠলো। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেও শেরিওঝার কাছ থেকে জবাব এল না। জ্বরের ঘোরে তখন সে কি সব অদ্ভুত উৎকট স্বপ্ন দেখতে লাগলো। ভয়ঙ্কর সে স্বপ্ন—একটা বিরাট কি যেন লাল জামা পরা, খোলা লালচে তুটো হাত, তাতে কালির বিদ্‌ঘুটে গন্ধ; কাঠের একটা বড় টুকরা, তার উপর একটা কসাই মাংস কাটছে, আর তার চারপাশে রক্তে-মাখা সব ছেলেরা খারাপ কথা বলছে। স্বপ্নের ঘোরে সে কত কি বলে

চললো, সে নিজেও জানলো না সে কি বলছে। বড়রা তার প্রলাপ শুনে সব ব্যাপারটা বুঝে নিল।

শেরিওঝাকে ওরা সবাই ভালবাসে একথা সত্যি, কিন্তু ভ্যালেরির চাইতেও ওরাই এখন তাকে অনেক অনেক বেশী যন্ত্রণা দিতে স্থরু করলো। বিশেষ করে ডাক্তার তো ওর হাত ছু'টোকে পেনিসিলিনের ছুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে একেবারে ঝাঁজরা করে দিল। ডাক্তারের এই অত্যাচারের জন্য ব্যথায় যত না হোক, অপমানে অভিমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগলো। ডাক্তার তাকে এভাবে শুধু শুধু যন্ত্রণা দিয়েই ছাড়লো না। একদিন সাদা পোশাক-পরা একটি মেয়েকে, তাকে নাকি নার্স না কি বলে, তার কাছে পাঠিয়ে দিল। ও এসে অদ্ভুত একটা যন্ত্র দিয়ে তার আঙ্গুল ফুঁড়ে অনেকটা রক্ত বের করে নিল। তার ওপর আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত ডাক্তারটি তাকে ঠাট্টা তামাশা করে, মাঝে মাঝে তার মাথায় চাঁটি মারে। এটাই কিন্তু সব চেয়ে অসহ্য পরিহাস।

এভাবে দিনের পর দিন শেরিওঝাকে ওদের অত্যাচার সহ্য করতে হোল। খেলতেও আর ভাল লাগে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে তার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে থাকে। এসব দুঃখের প্রথম ও মূল কারণটাই সে বার করতে চায়!

সে ভাবল—ওরকম উল্কি দেওয়ার জন্যই তো আমি অসুস্থ হয়েছি। ভাস্কার মামাকে না দেখলে তো ওসব কিছু হতো না। আর ভাস্কার মামা ওদের বাড়িতে বেড়াতে

না এলে ওসব অদ্ভুত জিনিসও আমি জীবনে দেখতে পেতাম না। হ্যাঁ সত্যিই তো, উনি এখানে না এলে এসব বিতিকিচ্ছি ব্যাপার একদম ঘটতো না, আমারও অসুখ করত না।

না, ভাস্কার মামার ওপর তো তেমন রাগও হচ্ছে না! কিভাবে একটা ঘটনা থেকে আর একটা ঘটনা ঘটে, এটা তারই একটা নমুনা মাত্র। দুঃখ যে কোথা থেকে আসবে কেউ বলতে পারে না।

ওরা সবাই মিলে তাকে খুশী রাখতে চায়। মা তাকে খেলবার জন্য ছোট লাল মাছ-ভরা একটা পাত্র উপহার দিল। সেই পাত্রের মধ্যে ছোট ছোট সবুজ গাছও আছে। একটা ছোট বাক্স থেকে এক রকম গুঁড়ো মাঝে মাঝে মাছটাকে খেতে দিতে হয়।

মা বললো, 'ও পশুপাখি খুব ভালবাসে। এই মাছটাও ওকে আনন্দ দেবে।'

মা অবশ্য সত্যি কথাই বলেছে। সে তার পোষা পশু-পাখিদের বড় ভালবাসে। পুষি জাইকা আর দাঁড়কাকটা তো তার কত প্রিয়। কিন্তু তা বলে মাছ তো আর পোষা যায় না! জাইকার গা কেমন নরম তুল্‌তুলে আর পশমের মত গরম। ওকে নিয়ে খেলা করতে কেমন মজা লাগে। ও বুড়ো আর গোমড়ামুখো না হওয়া পর্যন্ত ওকে নিয়ে বেশ খেলা করা যাবে। আর দাঁড়কাকটাও ভারী মজার, সব সময়েই কেমন খুশী খুশী ভাব। শেরিওঝাকে ওটা বড্ড ভালবাসে। ঘরময় ওটা এদিক ওদিক উড়ে বেড়াবে, কখনও বা চামচে

ঠোঁটে নিয়ে পালাবে। আবার শেরিওঝা ডাকলেই তার কাছে চলে আসবে। কিন্তু মাছ ওর লেজ দোলানো ছাড়া আর কি করতে পারে? পুষি আর দাঁড়কাকের মত অত মজার হবে কি করে? মাছ তো ভারী বোকা·····মা কেন এসব বোঝে না?

এখন শেরিওঝা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তার খেলার সঙ্গীদের কাছে পেতে চাইছে। শুরিককে বড্ড কাছে পেতে ইচ্ছে করে। জানালা খোলা থাকতে থাকতেই শুরিক একবার জানালার ওদিকে দাঁড়িয়ে ওকে ডাক দিল—'শেরিওঝা, কেমন আছ?'

শেরিওঝা তড়াক করে উঠে বসে বলল, 'এসো, ভেতরে এসো।'

শুরিকের মাথাটা শুধু জানালার তাকের উপর দিয়ে দেখা গেল। 'ওরা আমাকে ঢুকতে দেয় না যে! তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে বাইরে এসো।'

শেরিওঝা আগ্রহভরা স্বরে প্রশ্ন করে আবার, 'এতদিন ধরে কি করছো তুমি?'

'বাবা আমাকে একটা ব্যাগ কিনে দিয়েছে। ওটা নিয়ে এবার স্কুলে যেতে হবে। আমাকে স্কুলে ভর্তি করে নিয়েছে। জান, আরসেণ্টিও তোমার মত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আর কেউ অসুস্থ হয়নি কিন্তু। আমারও কিছু হয়নি। আর ভ্যালেরিকে অনেক দূরে অন্য একটা স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। এখন ওকে অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয়।'

এত সব খবর জমা হয়ে আছে!

শুরিক আবার বলে ওঠে, 'আচ্ছা, আজ চলি। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে বাইরে এসো তো',.........শেষ কথাটা শোনা গেল অনেক দূরের থেকে নিশ্চয়ই মাসী উঠানে এসে গেছে।

ওর মত শেরিওঝাও যদি অমনি করে বাইরে দৌড়ে চলে যেতে পারতো শুরিকের সঙ্গে পথে পথে ঘুরতে পারতো! অসুখে পড়ার আগের দিনগুলো সত্যি কী আনন্দেরই না ছিল! আর এখন......তার কি কি ছিল......আর এখন সে কি হারিয়েছে, কি নেই তার, মনে পড়ছে এমনি একলা শুয়ে শুয়ে......

বুদ্ধির অগোচরে

তারপর একদিন বিছানা ছেড়ে উঠে একটু আধটু বাইরে যাবার অনুমতি পেল সে। আবার বুঝি কিছু হয় এই ভয়ে বাড়ি থেকে বেশী দূরে বা অন্য কোন বাড়িতে ওরা তাকে যেতে দিত না। সকালবেলায় যখন তার বন্ধুরা সবাই স্কুলে চলে যায় শুধু তখনই ওকে বাইরে বের হতে দেওয়া হয়। শুরিকের বয়স এখনও সাত বছর পূর্ণ হয়নি, কিন্তু তবুও ওকে স্কুলে যেতে হচ্ছে। ওরা বাবা-মা ঐ সব উল্কির ঘটনার পরেই ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। যখন তখন বাইরে বেরিয়ে দুষ্টুমিতে মন দিতে পারবে না। তাছাড়া মাস্টার মহাশয়দের চোখের সামনেও থাকবে। ছোটদের সঙ্গে খেলতে শেরিওঝার ভাল লাগে না।

একদিন সে উঠানে নেমে আসতেই দেখলো ছেঁড়া টুপি মাথায় অদ্ভুত চেহারার একটি লোক তাদের চালাঘরের পাশে এক গাদা কাঠের ওপর বসে আছে। মুখখানি তার বড্ড শুকনো আর গায়ের জামা শতচ্ছিন্ন। লোকটা একটা সিগারেটের খুব ছোট্ট একটা টুকরো থেকে ধূমপান করছে, টুকরোটা এতো ছোট যে মনে হচ্ছে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়েই বুঝি ধোঁয়াটা উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে। লোকটার আঙ্গুল এবার পুড়ে না যায়! অন্য হাতে একটা নোংরা ন্যাকড়া দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ফিতের পরিবর্তে দড়ি দিয়ে লোকটার জুতো বাঁধা। এক পলকে লোকটার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে শেরিওঝা এবার প্রশ্ন করলো, 'তুমি বুঝি কোরোসটিলেভের কাছে এসেছ ?'

লোকটা বললো, 'সে আবার কে ? আমি তাকে চিনি না।'

'তাহলে লুকিয়ানিচকে চাও ?'

'তাকেও আমি চিনি না।'

'ওরা কেউই বাড়ি নেই। শুধু আমি আর মাসী আছি ......আচ্ছা, তোমার ব্যথা লাগছে না ?'

'কোথায় ?'

'তোমার আঙ্গুল পুড়ে যাচ্ছে যে।'

'ও।' শেষবারের মত সিগারেটের টুকরোটাতে একটা টান মেরে সে ওটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুনটা নেভালো।

শেরিওঝা এবার বললো, 'তোমার ঐ হাতটা......ওটাও কি আগে পুড়িয়েছ নাকি?'

লোকটা কোন উত্তর দিল না। ওর দিকে করুণ কাতর দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে একটা মুখভঙ্গি করলো শুধু। শেরিওঝা অবাক হয়ে ভাবলো ও কেন আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছে?

লোকটা এবার ওকে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা খোকা, তোমরা এখানে কেমন আছ? বেশ ভাল?'

'হ্যাঁ, খুব ভাল আছি।'

'এখানে জিনিসপত্র বেশ ভালই পাওয়া যায়?

'কি রকম জিনিসপত্র?'

'আচ্ছা, তোমাদের কি কি জিনিসপত্র আছে বলতো?'

'আমার একটা সাইকেল আছে। তাছাড়া খেলনা তো আছেই। যত রকমের খেলনা চাও সব পাবে। লিয়োনিয়ার কিন্তু শুধু ঝুমঝুমি ছাড়া আর বিশেষ কোন খেলনা নেই।'

'আচ্ছা, তোমাদের কাপড়-চোপড় কোথায় থাকে বলতে পার খোকা? এই ধর কোট ও স্যুট তৈরী করবার কাপড়ের কথা বলছি।'

'ওসব তো আমাদের এখানে বিশেষ কিছু নেই। ভাস্কার মার ওখানে অনেক আছে।'

'ভাস্কার মা কে? কোথায় থাকে?'

আরও কি কথাবার্তা ওদের মধ্যে চলতো কে বলতে পারে। ঠিক সেই মুহূর্তে সদর দরজা খোলার শব্দ হোল।

লুকিয়ানিচ ঢুকেই লোকটাকে দেখতে পেয়ে বললো, 'কে তুমি ? কি চাও ?'

লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বেচারার মত করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, 'আমি কাজ খুঁজছি স্যার।'

'বাড়ির ভেতর ঢুকে কাজ খোঁজা হচ্ছে ? কোথায় থাক তুমি ?'

'থাকবার জায়গা নেই এখন।'

অস্পষ্টভাবে লোকটা উত্তর দিল।

'আগে কোথায় থাকতে ?'

'অনেকদিন আগেই সে আস্তানা ঘুচে গেছে।'

'তাহলে, জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছ বুঝি ?'

'হ্যাঁ, একমাস আগে ছাড়া পেয়েছি।'

'জেলে গিয়েছিলে কেন ?'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে লোকটা বললো, 'ওদের মতে আমার নিজের জিনিস আর পরের জিনিসে নাকি আমি তফাত কিছু দেখিনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার, ওসব আমি কিছুই করিনি। ভুল করে ওরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।'

'আচ্ছা, ছাড়া পেয়ে তুমি তোমার বাড়িতে না গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরঘুর করছো কেন বল তো ?'

'বাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। এখন সে আর একজন লোককে বিয়ে করেছে, সে একটা দোকানদার। তাই আমি ভবঘুরে হয়ে

পথে পথে ঘুরছি। আমার মা অনেক দূরে চিতায় থাকে। ভাবছি তার কাছেই চলে যাব।'

শেরিওঝা হাঁ করে অবাক হয়ে লোকটার কথা শুনেছে। এই লোকটা জেলে ছিল! বইয়ে সে জেলখানার ছবিদেখেছে ......শক্ত লোহার শিক দিয়ে ঘেরা জেলখানা...ঢাল-তলোয়ার হাতে গোঁফ-দাড়িওয়ালা পাহারাওয়ালারা জেলখানার ফটকে। ......লোকটার আবার মা-ও আছে তা'হলে! মা নিশ্চয়ই ওর জন্য কত কাঁদে। বেচারী মা......ছেলে এবার মায়ের কাছে ফিরে গেলে মা না জানি কত খুশী হবে! ছেলেকে মা এবার একটা পোশাক তৈরী করিয়ে দেবে, জুতোর ফিতেও কিনে দেবে।

লুকিয়ানিচ বলছে, 'চিতা...সে তো অনেকটা পথ। আচ্ছা তাহলে এখন কি করবে শুনি? সৎপথে রোজগার করবে তো? না, আবার সেই রকম তোমার নিজের আর আমার জিনিসের মধ্যে কোন ভেদাভেদ রাখবে না?'

'আপনার এই কাঠগুলো চিরতে দিন আমায়,' লোকটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো এবার।

'আচ্ছা, বেশ তো।' লুকিয়ানিচ চালা ঘরের ভেতর থেকে একটা করাত এনে লোকটার হাতে দিল। মাসী ওদের এই কথাবার্তা শুনতে পেয়ে কিছুক্ষণ হোল উঠানের একপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার কেন কে জানে মাসী হঠাৎ মুরগীগুলোকে ওদের খুপরীতে ঢোকবার জন্য ডাকাডাকি শুরু করে দিল। ওদের ঘুমের সময় কিন্তু এখনও হয়নি। তবুও

মাসী ওদের খাঁচায় পুরে ঘরের দরজাটায় তালা লাগিয়ে চাবিটা পকেটে রাখল। তারপর শেরিওঝাকে ফিসফিস করে বললো, 'লোকটার ওপর একটু নজর রেখো তো। দেখো, করাতটা যেন আবার নিয়ে না পালায়।'

তারপর থেকে শেরিওঝা লোকটার আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। তার ডাগর দু'টি চোখে কেমন একটু কৌতূহল, সন্দেহ, ভয়, করুণা মেশানো বিচিত্র দৃষ্টি। আর লোকটার সঙ্গে কথা বলতে সাহস হচ্ছে না তার। লোকটার জীবন কী রহস্য আর বৈচিত্র্যে ভরা, একথা ভেবে ভেবে তাকে যেন সে একটু শ্রদ্ধার চোখেই দেখছে। লোকটাও আর কোন কথা বলছে না। খুব উৎসাহ নিয়ে কাঠের বুকে করাত চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে একটু বসে সিগারেট বানিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

শেরিওঝাকে দুপুরে খেতে ডাকলে সে বাড়ির মধ্যে গেল। মা আর কোরোসটিলেভ আজ বাড়িতে নেই। ওরা তিনজনে খেতে বসলো। খাওয়া দাওয়ার পর লুকিয়ানিচ মাসীকে বললো, 'ঐ লোকটাকে আমার পুরনো জুতো জোড়াটা দিয়ে দিও তো।'

মাসী বললো, 'আরও কয়েকদিন ওটা তুমিই পরতে পারবে। লোকটার তো জুতো রয়েছে দেখলাম।'

'ঐ জুতো পরে ও চিতায় পৌঁছতে পারবে নাকি?'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কালকের অনেক খাবার রয়েছে, ওকে কিছু খেতে দিই।'

লুকিয়ানিচ এবার বিশ্রাম করতে গেল। মাসী খাবার টেবিলের ওপর থেকে টেবিলক্লথটা সরিয়ে রাখল। শেরিওঝা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'টেবিলক্লথটা সরালে কেন?'

মাসী বললো, 'দেখছ না কিরকম নোংরা লোকটা, টেবিলক্লথ ছাড়াই ওর চলবে।'

তারপর মাসী স্যুপটা গরম করে কয়েক টুকরো রুটি নিয়ে লোকটাকে ডেকে বললো, 'এই যে খেয়ে নাও।'

লোকটা এগিয়ে এলে মাসী ওর হাত মুখ ধোয়ার জন্য জল ঢেলে দিল। ছোট একটা তাকের ওপর ছুটো পাত্রে সাবান ছিল। একটা গোলাপী রঙের অন্যটা ছাই রঙের। লোকটা ছাই রঙের কাপড় কাচার সাবানটাকে নিয়ে হাত ধু'লো। গোলাপী রঙের সাবানটা দিয়ে যে হাত মুখ ধুতে হয় বেচারা বোধ হয় তা জানেও না, হয়তো টেবিলক্লথ বা আজকের স্যুপের মত গোলাপী সাবানটাও ওর জন্য নয়। ওকে কত নিরীহ আর গোবেচারাই না মনে হচ্ছে! সে কিছুটা অদ্ভুতভাবে, কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে গেল, যেন তার পায়ের ভরে মেঝেটা ভেঙে যাবে ভেবে ভয় পাচ্ছে। পাশা মাসীর নজর কিন্তু তার দিকে আছেই। তারপর খেতে বসে সে নিজের দেহের ওপর হাত দিয়ে ক্রস্ চিহ্ন আঁকল। শেরিওঝা দেখল, মাসী ওতে খুশী হয়েছে। ওকে অনেকটা ঝোল আর রুটি দিয়ে বললো, 'নাও পেট ভরে খেয়ে নাও।'

লোকটা যেন চক্ষের পলকে সবটা ঝোল আর তিন

টুকরো রুটি গোগ্রাসে গিলে ফেললো। মাসী আরও একটু ঝোল আর ছোট্ট একটা গ্লাসে একটু ভড্‌কা দিয়ে বলল 'এবার ভড্‌কা খেতে পার। খালিপেটে খেলেই অসুখ করে।'

খুব খুশী হয়ে মুখের কাছে গ্লাসটা তুলে ধরে ও বললো, 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।' তারপর এক লহমায় গ্লাসের তলানিটুকু পর্যন্ত ঢক ঢক করে গিলে ফেলে শূন্য গ্লাসটা টেবিলের ওপর রাখলো। শেরিওঝা সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওকে দেখছে আর ভাবছে, সত্যি লোকটা কি চটপটে! ও এবার আস্তে আস্তে খেতে লাগল এবং মাসীর সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে তুললো। ওর বৌ ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে সেকথা মাসীকে জানিয়ে ও বললো, 'জানেন, আমার অনেক জিনিস ছিল। সেলাইকল, গ্রামোফোন, বাসনপত্তর, কোনটার অভাব ছিল না। কিন্তু আমাকে ও একটা জিনিসও দিল না। আমাকে দেখেই বললো, 'যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও। আমার জীবনটা তো নষ্ট করেছ, আর কেন?' আমি ওকে অনেক অনুরোধ করে বললাম, 'শুধু গ্রামোফোনটা দাও আমাকে। ওটা তো আমাদের দুজনের টাকায় কেনা হয়েছিল। তবু ওটা দিল না। সে তার নিজের পোশাক করেছে আমার স্যুট কেটে। আমার কোট বেচে দিয়েছে দোকানে।'

'আগে কেমন ছিলে? দুজনে বেশ সুখী ছিলে?' মাসী প্রশ্ন করলো।

'হাঁ, একেবারে কপোত কপোতীর মত। আমাদের

দু'জনের মধ্যে কত ভালবাসাই না ছিল! সে আমার জন্যে একেবারে পাগল ছিল। কিন্তু এখন সব বদলে গেছে। একটা হতচ্ছাড়া লোককে বিয়ে করেছে, লোকটা দেখতে কদাকার, বেঁটে, একটা দোকানদার।'

তারপর সে তার মায়ের গল্প বলতে লাগলো। মা ওকে জেলখানায় কত কি জিনিস পাঠাত তাও বললো। ওর দুঃখের কাহিনী শুনে মাসী তো নরম হয়ে গেছে মনে হোল। এবার কয়েক টুকরো মাংস আর চা এনে দিল। তারপর একটা সিগারেটও দিল।

লোকটা আবার বলছে, 'মার কাছে যাচ্ছি। একটা কিছু তার জন্যে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হোত। গ্রামোফোনটা যদি নিতে পারতাম!'

শেরিওঝা ভাবলো, সত্যি বেচারা গ্রামোফোনটা পেলে কত খুশী হতো! ওরা মা-ছেলে গান বাজিয়ে শুনতে পেত!

মাসী সান্ত্বনার সুরে বললো, 'তুমি কাজকর্ম করতে আরম্ভ করলে, সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো। আবার সব হবে।'

'সবই তো বুঝি! কিন্তু যা ঘটে গেছে তারপর কাজকর্ম পাওয়াও বড় মুশকিল কিনা।' মাসী ওর দুঃখে দুঃখিত হয়ে বুঝি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। লোকটা আবার বললো, 'আমি অনেক কিছুই হতে পারতাম, দোকানদার ও হতে পারতাম, কিন্তু কিছু না করে অলসভাবে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। এখন অনুতাপ হচ্ছে।'

'সে তো তোমারই দোষ। কেন অমন করতে গেলে?'

'সে কথা ভেবে আজ আর লাভ কি বলুন? যা হবার হয়ে গেছে। আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি এবার বাইরে গিয়ে কাঠ চেরা শেষ করি গে।'

লোকটা এবার উঠানে ফিরে গেল। কিন্তু টিপ টিপ করে বৃষ্টি সুরু হওয়ায় মাসী শেরিওঝাকে বাইরে যেতে দিল না। শেরিওঝা হঠাৎ প্রশ্ন করলো, 'ঐ লোকটা ওরকম কেন?'

'ও জেলে ছিল কিনা। সব তো শুনলেই।'

'কেন জেলে গিয়েছিল?'

'কোন খারাপ কাজ করেছিল বোধহয়। ভাল কাজ করলে জেলে নিয়ে যেত না।'

লুকিয়ানিচ দুপুরের ঘুমটুকু সেরে উঠে এবার আবার অফিসে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। শেরিওঝা তার কাছে এসে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, লোকে মন্দ কাজ করলে তাকে জেলে নিয়ে যায় বুঝি?'

'হ্যাঁ, ঐ লোকটা অন্যের জিনিস চুরি করেছিল কিনা। ধর, আমি পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করলাম এবং তা দিয়ে একটা জিনিস কিনলাম। আর একটা লোক এসে সেটা না বলে নিয়ে গেল। এটা কি ভাল কাজ হোল?'

'না।'

'নিশ্চয়ই না, এটা খুব অন্যায়।'

'তাহলে, লোকটা ভাল নয়?'

'নিশ্চয়ই নয়।'

'তাহলে মাসীকে কেন বললে তোমার পুরনো জুতো জোড়াটা ওকে দিয়ে দিতে ?'

'ওর জন্য দুঃখ হোল কি না, তাই।'

'যারা মন্দ কাজ করে, তাদের জন্য তাহলে তোমার কষ্ট হয় ?'

'হাঁ……না……তা কথাটা কি জান….. ও যে মন্দলোক তা তার জন্য আমার কষ্ট নয়। ওর ছেঁড়া জুতোটা দেখে, ওকে এরপর খালি পায়ে হাঁটতে হবে ভেবেই ওর জন্য কষ্ট হোল। তাছাড়া, কোন লোককে তুমি মন্দ ভেবে সব সময় কেবল ঘৃণাই করতে পার না। তবে হাঁ, একথা সত্যি লোকটা চোর না হলে ওকে খুশী হয়ে খুব ভাল জুতোই দিতাম। আচ্ছা, এবার আমাকে যেতে হবে।' লুকিয়ানিচ তাড়াতাড়ি চলে গেল।

শেরিওঝা ভাবতে থাকে লুকিয়ানিচ এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে যার কিছুই বোঝা যায় না যেন। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ও এবার বাইরের ঝিরঝিরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আনমনে ভেবে চললো লুকিয়ানিচের কথাগুলোর কি মানে হতে পারে। হঠাৎ দেখলো লোকটা ছেঁড়া টুপিটা মাথায় দিয়ে একজোড়া জুতো হাতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর মা লিয়োনিয়াকে কোলে নিয়ে ফিরলো। শেরিওঝা তক্ষুণি মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা মা, তোমার মনে আছে স্কুলের একটা বাচ্চা ছেলে

একবার একটা খাতা চুরি করেছিল? ওকে কি জেলে ধরে নিয়ে গিয়েছিল নাকি?'

'কেন, জেলে নেবে কেন?' মা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো।

'কিন্তু কেন জেলে নেবে না?'

'ও তো বাচ্চা ছেলে। মাত্র আট বছর তো বয়স।'

'তাহলে ছোট্ট ছেলেদের বুঝি ওসব করতে দেওয়া হয়?'

'কি সব?'

'চুরি।'

'না, বাচ্চারাও চুরি করবে না। আমি ওকে খুব ধমকে দিয়েছিলাম, তাই আর কোনদিন ও চুরি করবে না। কিন্তু এসব কথা ভাবছো কেন বল তো?'

শেরিওঝা এবার মাকে জেল-ফেরত ঐ লোকটার সব গল্প বললো। সব শুনে মা বললো, 'হাঁ, কতকগুলো লোক ওরকম মন্দ থাকে। তুমি আরও বড় হলে এসব বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো, কেমন? এখন মাসীর কাছ থেকে রিপু করার ছুঁচটা নিয়ে এসোতো।'

শেরিওঝা ছুঁচটা নিয়ে এসে আবার বললো, 'লোকটা কেন চুরি করলো?'

'কাজ করতে ওর হয়তো ভাল লাগতো না।'

'কিন্তু, ও কি জানতো না চুরি করলে জেলে যেতে হয়?'

'নিশ্চয়ই জানতো।'

'তাহলে? ওর ভয় করলো না? জেলখানা তো কী ভয়ঙ্কর জায়গা, না মা?'

মা এবার বিরক্তিভরা সুরে বলে উঠলো, 'অনেক হয়েছে, আর নয় এসব কথা। আমি তো তোমাকে বললামই এখনও এসব ব্যাপার বোঝবার মত বড় হও নি তুমি। অন্য কিছু ভাব, এবিষয়ে আর একটি কথাও আমি শুনতে চাইনা, বুঝলে ?'

শেরিওঝা মায়ের বিরক্তিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। তারপর রান্নাঘরে ঢুকে একটা গ্লাসে খানিকটা জল ঢেলে নিল। মাথা হেলিয়ে মুখটা যথাসম্ভব হাঁ করে জলটা এক ঢোকে গিলে ফেলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু জলটা পড়ে ওর জামা ভিজে গেল। পেছনের কলারটাও ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গেল, পিঠে জল গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু ভিজে শার্টের কথা সে কাউকে কিছু বললো না। বললেই ওরা সবাই মিলে তাকে বকবে আর এ নিয়ে অকারণ হৈ হৈ সুরু করবে। রাত্রিবেলা ঘুমুতে যাবার আগে ভিজে শার্টটা তার গায়েই শুকিয়ে গেল।

সে ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে বড়রা খাবারঘরে বেশ জোরে জোরে কথা বলতে সুরু করল।

কোরোসটিলেভকে বলতে শুনলো, 'সব ব্যাপারেই একটা হাঁ কি না স্পষ্ট জবাব শুনতে চায় ও। এই দু'য়ের মাঝে কিছু একটা বললেই ও বেচারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।' লুকিয়ানিচ বলছে, 'আমি তো পালিয়ে বাঁচলাম তখন। ওর হাজার প্রশ্নের জবাব কে দেবে ?'

মা বলছে, 'বাচ্চাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই। ও যা

বুঝবে না তা নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করা কেন ? তাতে কি লাভটা হবে শুনি ; বরং উল্টো ফল হয় তাতে। ওর মনের ওপর অকারণ চাপ পড়ে আর আজে বাজে যত ভাবনা ভাবতে স্বুরু করে। একটা লোক খারাপ কাজ করলে শাস্তি পায়, ব্যস, শুধু এটুকু জানাই ওর পক্ষে যথেষ্ট। তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি ওর সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে কখনও এত আলোচনা করো না তোমরা।'

লুকিয়ানিচ এবার প্রতিবাদের স্বুরে বললো, 'কে ওর সঙ্গে ওসব নিয়ে আলাপ করতে গেছে ? ওই তো প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছে।'

পাশের অন্ধকার ঘর থেকে শেরিওঝা এবার চাপা গলায় ডাকলো, 'কোরোসটিলেভ!' সবাই তক্ষুণি নীরব হয়ে গেল।

কোরোসটিলেভ উত্তর দিল, 'এই যে আমি, যাচ্ছি—' এবং ঘরে ঢুকে গেল।

শেরিওঝা প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, দোকানদার কাকে বলে ?'

কোরোসটিলেভ স্নেহমাখানো স্বরে বললো, 'এখনও ঘুমোও নি দুষ্টু ছেলে ? এই যে আমি তোমার পাশে বসেছি, নাও, এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মী ছেলের মত, কেমন ?'

শেরিওঝা তেমনই বড় বড় চোখ দু'টি মেলে অস্পষ্ট আলোতে তাকিয়ে রইলো তার প্রশ্নের উত্তর শোনার আশায়। কোরোসটিলেভ তার মুখের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে খুব চুপিসারে (যাতে ওঘর থেকে মা কিছু শুনতে না পায়) তার প্রশ্নের জবাবটা তার কাণে কাণে বলে দিল।

বিরক্তি

শেরিওঝা আবার অসুখে পড়লো। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, টনসিলের যন্ত্রণা সুরু হোল। ডাক্তার এসে বললো, 'গ্ল্যাণ্ডের অসুখ।' আবার ডাক্তারের অত্যাচার সুরু হোল। কডলিভার খাওয়া, গলায় পুলটিস লাগানো, গায়ের তাপ নেওয়া, ডাক্তারের নির্দেশ মত সব চললো। কি একটা কালো কালো মলম এক টুকরো ন্যাকড়ায় বেশ করে লাগিয়ে ওরা তার ঘাড়ে গলায় সেঁটে দিল। পুলটিসটার ওপর আড়াআড়ি-ভাবে আঠালো একটা ফিতে লাগিয়ে তারপর তুলো দিয়ে ওর দু'কাণের পাশ দিয়ে মাথায় ঘাড়ে আঁটসাঁট করে ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে দিল। মাথাটা ঠিক যেন একটা বোর্ডে ঠুকে দেওয়া পেরেকের মত হোল, আর এদিক ওদিকে ফেরানো যাচ্ছে না।' উঃ! এভাবে বাঁচতে হবে!

এবার অবশ্য ওরা তাকে সব সময়ের জন্য জোর করে বিছানায় শুইয়ে রাখেনি। গায়ে জ্বর না থাকলে আর বৃষ্টি না পড়লে তাকে একটু আধটু বাইরে বের হতে দেওয়া হোত। কিন্তু তা খুব কমই হোত। কারণ প্রায় রোজই হয় তার গায়ে একটু একটু জ্বর থাকবে, না হয় বাইরে টিপটিপানি বৃষ্টি থাকবে। তার জন্য রেডিওটাকে ওরা সর্বদাই খুলে রাখে। কিন্তু কত আর রেডিও শুনতে ভাল লাগে? ওটা শুনতে শুনতে কেমন একঘেয়ে হয়ে গেছে।

আর বড়রা এত অলস যে তুমি যখনই ওদের একটা বই

পড়ে শোনাতে বলবে বা একটা গল্প বলতে বলবে তখনই ওরা বলবে ওদের নাকি অনেক কাজ আছে। কিন্তু মাসী যখন রান্না করে তার হাত দু'টোই তো কেবল কাজ করতে থাকে, জিবটা তো আর কাজ করে না। তবে কেন রান্না করতে করতে মাসী ওকে একটা গল্প শোনাতে পারে না?

মায়ের কথাই ধর না কেন। মা স্কুলে থাকলে বা লিয়োনিয়ার ভিজে জাঙ্গিয়া বদলাতে থাকলে কিংবা স্কুলের খাতা দেখতে থাকলে এক কথা। কিন্তু মা যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুল আঁচড়াতে থাকে, সাজতে থাকে আর আয়নার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে তখন কি বলতে হবে যে মা খুব কাজে ব্যস্ত আছে? মাকে যদি তখন শেরিওঝা আদরের সুরে বলে, 'মা, একটা গল্প পড় না?'

মা বলবে, 'একটু অপেক্ষা কর। দেখছো না আমি ব্যস্ত আছি?'

'আজ অমন করে চুল আঁচড়াচ্ছো কেন মা?' শেরিওঝা মায়ের লম্বা বেণীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

'রোজ রোজ এক রকম ভাল লাগে না, তাই।'

'কেন ভাল লাগে না?'

'এমনিই।'

'তুমি মুচকি মুচকি হাসছো কেন?'

'এমনিই।'

'এমনিই কেন? কোন কারণ নেই কেন?'

'ওঃ, শেরিওঝা, আর জ্বালিও না বাপু।'

অবাক হয়ে সে ভাবলো মাকে আবার কখন জ্বালাতন করলাম! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললো, 'আচ্ছা, যাই হোক আমাকে একটা গল্প পড়ে শোনাও না মা?'

'আজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তখন গল্প পড়ব।'

কিন্তু শেরিওঝা জানে সন্ধ্যেবেলায় মা বাড়ি ফিরে লিয়োনিয়াকে খাওয়াবে, কোরোসটিলেভের সঙ্গে গল্প করবে তারপর স্কুলের একগাদা খাতা নিয়ে দেখতে বসবে। গল্প পড়া আর হবে না।

সারাদিনের কাজকর্ম শেষ করে সন্ধ্যেবেলায় মাসী তার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করবার জন্য চুপচাপ কোলে হাত রেখে আনমনে বসতেই শেরিওঝা তার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ে রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে আব্দারের সুরে বললো, 'একটা গল্প বল।'

'ওমা, গল্প আর কি শুনবে? সব গল্পই তো তোমার মুখস্থ।'

'তা হোক গে। তবুও একটা বল না।'

সত্যি, মাসীটাও কী অলস! যা হোক, শেষ পর্যন্ত মাসী গল্প বলতে সুরু করলো, 'আচ্ছা, শোন তা'হলে। অনেক, অ-নে-ক দিন আগে এক যে ছিল রাজা আর তার ছিল এক রাণী। তাদের একটি মেয়েও ছিল। একদিন হয়েছে কি জান'...

শেরিওঝা আগ্রহভরে এবার প্রশ্ন করলো, 'মেয়েটি কি খুব সুন্দরী ছিল?'

ও জানে মেয়েটি খুব সুন্দরী হবেই। সবাই তাই জানে। কিন্তু মাসী কেন বলবে না ওকথাটা। গল্প বলতে গেলে কোন কথাই কিন্তু বাদ দেওয়া উচিত নয়।

মাসী আবার বলছে, 'হাঁ, খুব সুন্দরী মেয়ে। তারপর একদিন সেই রাজকুমারী ভাবলো এবার বিয়ে করবে। দেশ দেশান্তর থেকে কত রাজকুমার এলো তাকে বিয়ে করতে......।'

গল্পটা চিরন্তন ধারায় এগিয়ে চললো। শেরিওঝা একমনে শুনতে লাগলো, তার ডাগর সুন্দর মায়াময় চোখ দু'টি কৌতূহল আর আগ্রহে ভরে উঠলো। সে এই গল্পের প্রতিটি কথা জানে, কিন্তু তা বলে গল্প কি কখনও পুরানো হয়?

যে গল্পের শেষ নেই, এ যে সেই গল্প! তাই সব সময়েই শুনতে ভাল লাগে তার। গল্পের প্রতিটি কথাই যে ও বুঝতে পারে তা নয়। তবে নিজের মত করে সে সমস্ত গল্পটা ঠিকই বুঝে নেয়। এই যেমন ঘোড়ার পা দুটো মাটিতে শেকড় গেড়ে বসে পড়ল—তারপর আবার চলল লাফিয়ে। তাহলে শেকড়গুলো নিশ্চয়ই কেটে দেওয়া হলো।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্রির আঁধার নেমে আসে। ঘরের মধ্যেও আঁধার ঘনিয়ে এলো। মাসীর গল্প বলার একটানা সুরেলা স্বর ছাড়া জগতে আর কিছুই শোনবার নেই যেন। সে আর মাসী ছাড়া জগতে আর কেউ নেই। ফার স্ট্রীটের এই বাড়িটাকে ঘিরে গভীর নীরবতা নেমে এলো।

গল্প এক সময় শেষ হয়ে গেল। অনেক অনুনয় বিনয়

করে বললেও মাসী আর দ্বিতীয় গল্প বলতে রাজী হোল না। একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করতে করতে মাসী আবার রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। এবার সে একেবারে একলা। এখন সে কি করবে? শরীর ভাল না থাকলে খেলনাগুলো দিয়েও খেলতে একদম ভাল লাগে না যে! ছবি আঁকতেও ভাল লাগে না। বাড়ির ভেতর বদ্ধ জায়গায় সাইকেলেও চড়া যায় না।

অসুস্থতার চাইতে এই একেঘেয়েমিই ওকে বড্ড ক্লান্ত করে তোলে। মনটা আবার কেমন ভার হয়ে ওঠে, চারদিকে সবকিছু কেমন বিবর্ণ মনে হয়।

লুকিয়ানিচ একটা বাণ্ডিল হাতে ফিরলো। কি জানি একটা কিনেছে। বাণ্ডিলটা খুলতেই একটা ছাইরঙের বাক্স বেরিয়ে পড়লো। শেরিওঝা আগ্রহভরে ওটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ধৈর্য ধরে দেখতে লাগলো লুকিয়ানিচ কখন ওটাকে খোলে। লুকিয়ানিচ সুতোটা এত আস্তে আস্তে খুলছে কেন? একটা ছুরি দিয়ে পট্ করে কেটে ফেললেই তো পারে। কিন্তু না, সে নিপুণ হাতে সুতোটা খুলছে, কেননা ওটা হয়তো কোন কাজে লাগবে আবার। কেটে ফেললে তো নষ্ট হয়েই যাবে কিনা।

শেরিওঝা দু'চোখে অধীর আগ্রহ নিয়ে সুন্দর বড় বাক্সটার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু বাক্সটা খুলবার পর ওটার মধ্য থেকে বের হলো রবার-সোলের একজোড়া জুতো, ঠিক এরকম না হলেও প্রায় একরকম দেখতে এমন জুতো তারও

ছিল একজোড়া। সেটা তার একটুও ভাল লাগতো না কিন্তু। এখন লুকিয়ানিচের জুতো জোড়াটার দিকে তাকাতেও ভাল লাগল না। উদাস ও বিরক্তি স্বরে প্রশ্ন করলো, 'কি ওটা ?'

'দেখছো না একজোড়া বুট জুতো। যুবকরা এই জুতো পরে না, বুড়োরাই শুধু পরে, বুঝলে ?'

'তাহলে তুমি বুঝি বুড়ো ?'

'এটা পরলে তাই হবো বটে।'

জুতোটা পরে লুকিয়ানিচ বললো, 'বাঃ! বেশ আরাম পাচ্ছি তো!' তারপর মাসীকে দেখাতে চলে গেল। শেরিওঝা এবার খাবার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে আলো জ্বালবার জন্য সুইচ টিপলো।

বোতলের মধ্যে মাছগুলো বোকার মত সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। শেরিওঝার ছায়াটা জলের ওপর পড়তেই ওরা ওপরের দিকে ভেসে উঠলো আর মুখ খুলে হাঁ করতে লাগলো কিছু খাবার পাবার আশায়।

শেরিওঝা অবাক হয়ে ভাবলো, ওরা কি ওদের গায়ের তেল খেতে পারে ? এই ভাবনাটা মনে হতেই ও কড-লিভারের শিশিটা নিয়ে ছিপি খুলে কয়েক ফোঁটা কডলিভার জলের মধ্যে ফেলে দিল। মাছগুলো লেজের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কেমন হাঁ করলো কিন্তু কডলিভার গিললো না তো! আরও কয়েক ফোঁটা টপটপ করে ফেলতেই মাছগুলো অন্যদিকে পালিয়ে গেল।

ওরাও তাহলে কডলিভার ভালবাসে না !

সত্যি, ওরও কিছু যেন আর ভাল লাগছে না। একঘেয়ে, বিরক্তিকর প্রতিটি মুহূর্ত ! এই একঘেয়েমি ঘোচাবার জন্যই ওর এখন বড্ড দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে হোল। একটা ছুরি নিয়ে দরজার গায়ে যেখানটায় রঙ উঁচু উঁচু হয়ে আছে ঠিক সেখানটায় আঁচড় কাটতে লাগলো। এরকম করতে যে ওর খুব ভাল লাগছে তা ঠিক নয়। তবুও কিছু একটা করা চাই তো। এবার সে মাসীর জাম্পার বোনার উলের বলটা নিয়ে সবটা টেনে খুলে ফেলে আবার উল জড়াতে চাইল, কিন্তু পারলো না। সে জানে, সে দুষ্টুমি করছে আর পাশা মাসী তা দেখতে পেলে ভীষণ বকুনিও দেবে, আর সে তখন কেঁদেও ফেলবে। সত্যি সত্যি মাসীর বকুনি সে খেল এবং কাঁদলও। তবু এই দুষ্টুমিতে একটু যেন ভালই লাগছে, একঘেয়েমিটা একটু কেটে যাচ্ছে। মাসী বকল, সে কাঁদল—অন্ততঃ একটা কিছু তো হোল।

তারপর মা লিয়োনিয়াকে নিয়ে বাড়ি ফিরলে নীরব নিঝুম বাড়িটা আবার যেন প্রাণ ফিরে পেল। লিয়োনিয়া কাঁদতে লাগলো, মা ওকে আদর করে ভিজে জাঙ্গিয়া বদলে দিল। তারপর তাকে চান করালো। এখন লিয়োনিয়া আর আগের মতন ছোট্টটি নেই, বেশ মানুষের মত দেখতে হয়েছে। তবে একটু বেশী মোটা হয়ে গেছে। এখন ও দু'হাতে একটা ঝুমঝুমি ধরতে পারে আর ওটা নিয়েই আপন মনে

খেলা করে। সারাটাদিন তো শেরিওঝাকে ওর জন্য কিছুই করতে হয় না।

রাত্রিবেলা সবার শেষে কোরোসটিলেভ বাড়ি ফেরে। তখন প্রত্যেকেই একটা না একটা কাজে তাকে ডাকে। শেরিওঝার সঙ্গে সবে হয়তো একটু কথা বলতে স্থুরু করলো বা একটা গল্প পড়তে রাজি হোল, ব্যস ঠিক তখনই টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠবে। আর মা তো প্রতিটি মুহূর্তে তাকে এটা ওটা সেটার জন্য বিরক্ত করবে, ঘুরে ফিরে একটা না একটা কথা বলবে, অন্যদের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষাও করবে না। ঘুমোবার আগে লিয়োনিয়া কান্না জুড়বে, আর তখন মা আর কাউকে নয়, কোরোসটিলেভকেই ডাকবে, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে ওকে ঘুম পাড়াবার জন্য। তখন শেরিওঝারও দু'চোখ ভরে ঘুম নেমে আসতে চাইবে। এমনি করে কোরোসটিলেভের সঙ্গে ওর গল্প করার, কথা বলার সব আশা ফুরিয়ে যায়। আবার কখন কোরোসটিলেভের সময় হবে কে জানে?

তবুও মাঝে মাঝে এক একটা স্থন্দর সন্ধ্যায় যখন লিয়োনিয়া একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়ে আর মা স্কুলের খাতা দেখতে ব্যস্ত থাকে তখন কোরোসটিলেভ ওর পাশে বিছানায় বসে ওকে গল্প শোনায়। প্রথম প্রথম সে তেমন ভাল করে গল্প বলতে পারতো না, জানতো না কেমন করে গল্প বলতে হয়। কিন্তু শেরিওঝা তাকে গল্প বলতে শিখিয়ে দেওয়ার পর এখন সে চমৎকার গল্প বলতে পারে।

সুন্দর গুছিয়ে বলতে সুরু করে, 'এক যে ছিল রাজা, তার ছিল এক রাণী'......শেরিওঝা মন দিয়ে গল্প শুনবে আর একটু ভুল চুক হলেই শুধরে দেবে। এভাবে গল্প শুনতে শুনতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে।

একঘেয়ে দিনগুলো যখন তার আর কাটতে চায় না, যখন কোন কিছুই করতে ইচ্ছে করে না কেবল দুষ্টুমি করতেই মন চায়, তখনও কিন্তু কোরোসটিলেভের সুন্দর হাসিমাখা চেহারাখানি, সবল বলিষ্ঠ হাত দু'খানি আর গুরুগম্ভীর সস্নেহ স্বর, সমস্ত কিছুই ওর বড্ড ভাল লাগে। কোরোসটিলেভকে সে দিনের পর দিন আরও নিবিড় করে ভালবাসে। লিয়োনিয়া আর মা-ই শুধু নয়, শেরিওঝাও কোরোসটিলেভের এক আপনার জন, একথা ভাবতে তার ভাল লাগে আর একথা ভাবতে ভাবতেই ও ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে।

হোমোগোরি

হোমোগোরি......হোমোগোরি......

মা আর কোরোসটিলেভ আজকাল কথা বললেই শেরিওঝা কেবল এই অদ্ভুত শব্দটাই শুনতে পায়।

'হোমোগোরিতে চিঠি দিয়েছ তো ?'

'ওখানে কাজের চাপ কম থাকলে আমি ভাবছি পলিটিক্যাল ইকনমিক্সের পরীক্ষাটা দিয়ে নেব।'

'হোমোগোরি থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। মেয়েদের স্কুলের একটা কাজ খালি আছে লিখেছে।'

'হোমোগোরিতে সব ব্যবস্থাই ঠিক হয়ে গেছে।'

'এটাকে আবার হোমোগোরিতে নেওয়া কেন? পোকায় কেটে তো ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।' (দেরাজের কথা বলছে।)

হোমোগোরি……… হোমোগোরি……… হোমোগোরি এই একটা শব্দ শুনে শুনে ওর কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল যে! জায়গাটা কোথায়? হয়তো অ-নে-ক দূরে, অ-নে-ক উঁচুতে পাহাড়ের ওপর, যেমনটি ছবিতে দেখা যায়।* কত লোক পাহাড় বেয়ে বেয়ে একেবারে চূড়োয় উঠে যাচ্ছে। একটা পাহাড়ের উপর মেয়েদের ইস্কুল। বাচ্চারা দল বেঁধে পাহাড়ের নিচে স্লেজগাড়িতে চড়ে যাচ্ছে, শেরিওঝা একটা ছবিও এঁকে ফেললো লাল পেনসিল দিয়ে। তারপর হোমোগোরি, হোমোগোরি বলে একটা গানের সুর গুন গুন করে ভাঁজতে লাগলো।

ওরা দেরাজের কথা বলছে, আমরা তাহলে ওখানে গিয়েই থাকবো বুঝি। চমৎকার হবে কিন্তু! পৃথিবীতে এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। ঝেঙ্কা, ভাস্কা চলে গেছে। এখন আমরাও যাচ্ছি। সব সময় একটা জায়গায় পড়ে না থেকে এরকম অন্য জায়গায় গেলে সবাই বেশ ওদের হোমড়া চোমড়া লোক ভাবে। মাসীকে সে প্রশ্ন করলো একদিন, 'হোমোগোরি কি অনেক দূর?'

'হাঁ, অনেক দূরের পথ।' মাসী কেমন একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললো।

Holmogory=Holm—পাহাড়, gora—পর্বত।

'আমরা ওখানে থাকতে যাচ্ছি, তাই না ?'

'আমি ঠিক বলতে পারি না শেরিওঝা। কি ব্যবস্থা হয়েছে আমি জানি না।'

'আচ্ছা, ওখানে কি ট্রেনে চড়ে যেতে হয় ?'

'হঁ্যা, ট্রেনে।'

তারপর ও মা আর কোরোসটিলেভকে প্রশ্ন করলো, 'আমরা হোমোগোরিতে যাচ্ছি, তাই না ?' ওকে ওদের অনেক আগেই একথা বলা উচিত ছিল, হয়তো বলতে ভুলে গেছে। ওরা কোন উত্তর না দিয়ে দু'জন দু'জনের দিকে আড়চোখে তাকালো, তারপর দু'জনেই ওর দৃষ্টি এড়াবার জন্য অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো, শেরিওঝা চেষ্টা করেও ওদের চোখের দিকে চাইতে পেল না।

একটু অবাক হয়ে সে আবার প্রশ্ন করলো, 'আমরা কি যাচ্ছি ? আমরা যাচ্ছি। তাই না ?'

একি, এরা উত্তর দিচ্ছে না কেন ?

একটু পরে মা কি ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, 'তোমার বাবা ওখানে বদলী হয়েছেন শেরিওঝা।'

'আমরা কি তার সঙ্গে ওখানে যাচ্ছি ?'

তার প্রশ্নটা খুবই সোজা আর সোজা উত্তর পাবার জন্যই সে অস্থির হয়ে উঠলো।

কিন্তু মা যথারীতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে লাগল।

'ওকে একা যেতে দিই কেমন করে বল ? একা গেলে ওর কত কষ্ট হবে বোঝতো ? কাজের শেষে বাড়ি ফিরে,

দেখবে শূন্য বাড়ি। সব অগোছালো, কেউ তাকে খাবার দেবার জন্য বসে নেই, কেউ কথা বলবার নেই। তোমার বাবার অবস্থাটা তাহলে কি হবে বলতো?' কিছুক্ষণ নীরব থেকে মা শেষ পর্যন্ত আসল কথাটা বলে ফেললো, 'তাই আমি তোমার বাবার সঙ্গে যাচ্ছি।'

'আর আমি?'

কোরোসটিশেভ কেন কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে অমন চুপ করে আছে? মা আর কোন কথা না বলে তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে শুধু তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে কেন? সে এসবের অর্থ কিছুই বুঝতে পারছে না যে! এবার কেমন একটা অজানা আতঙ্কে শিউরে ওঠে দু'পা আছড়ে চীৎকার করে উঠলো, 'আর আমি! আমি যাব না?'

তাকে আদর করা থামিয়ে মা এবার ধমকে উঠলো, 'আঃ, এভাবে পা আছড়াবে না বলছি! এরকম করলে লোকে অসভ্য ও অভদ্র বলে, বুঝলে? আর এরকম করো না যেন। তোমার যাওয়ার কথা বলছো? কিন্তু এখনই কেমন করে যাবে বল? এই তো সবে এতবড় একটা অসুখ থেকে উঠলে এখনও একেবারে সুস্থ হওনি। একটু কিছু অনিয়ম হলে এখনও তোমার গায়ে জ্বর উঠছে। ওখানে আমরা নূতন একটা পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়বো। কি করব কিছুই জানি না। তাছাড়া, ওখানকার আবহাওয়া তোমার সহ্য হবে কিনা তাও সন্দেহ। ওখানে গেলে আবার তোমার অসুখ হবে নির্ঘাত। আর তুমি ওখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে বাড়িতে তোমাকে

কার কাছে রেখে আমরা কাজে যাব? ডাক্তারও বলেছে তোমাকে এখন ওখানে নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

মার কথাগুলো শেষ হবার আগেই শেরিওঝা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করেছে, ওর বড় বড় চোখ দু'টো থেকে টপ টপ করে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। ওরা নিজেরাই কেবল যাবে, ওকে সঙ্গে নেবে না। কাঁদতে কাঁদতে ও মায়ের শেষের দিকের কথাগুলো একটাও শুনতে পেল না।

মা তখনও বলে চলেছে, 'তুমি এখানে মাসীর কাছে থাকবে। যেমনটি আছ ঠিক তেমনটি থাকবে। কিছু ভেবো না লক্ষ্মী ছেলে।' কিন্তু সে যেমন ছিল তেমনটি থাকতে চায় না, চায় না। কোরোসটিলেভ আর মায়ের সঙ্গে যেতে চায়।

কাঁদতে কাঁদতে অস্ফুট স্বরে সে আবার বললো, 'আমি হোমোগোরি যাব।'

'শোন সোনা ছেলে, আর কেঁদো না, চুপ কর এবার। হোমোগোরিতে গিয়ে কি হবে? ওখানে নূতন কিছুই নেই।'

'হাঁ, আছে।'

'মায়ের সঙ্গে এমনি করে কথা বলে নাকি? মা কি কখনও মিথ্যে কথা বলে? এখানে কি তুমি চিরদিন পড়ে থাকবে নাকি? বোকা ছেলে, চুপ, চুপ। আর কেঁদোনা... অনেক হয়েছে। শীতকালটা এখানে থাক। তারপর বসন্তে বা গরমে বাবা এসে তোমায় ওখানে নিয়ে যাবে। আবার আমরা সবাই এক সঙ্গে থাকবো। তোমাকে ছেড়ে আমরাই.

বা অনেক দিন থাকব কেমন করে বল? তুমি তো সবই বোঝ সোনা।'

হাঁ, সে সব বোঝে। কিন্তু আসছে গরম কালের মধ্যে যদি সে সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ওঠে! তাছাড়া, সারাটা শীত এভাবে অপেক্ষা করে থাকা কি সহজ কথা! শীত তো সবে সুরু হোল। এর শেষ হতে অ-নে-ক দেরি এখনও......ওরা চলে যাবে আর সে এখানে পড়ে থাকবে একথা যে ও ভাবতেই পারে না। অনেক দূরে কোথায় ওরা তাকে ছেড়ে থাকবে আর একটিবারও তার কথা ভাববে না, একটুকুও ভাববে না। ওরা ট্রেনে চড়ে ওখানে যাবে কিন্তু ওকে সঙ্গে নেবে না! কেমন একটা অপমান, দুঃখ আর নিরাশার অনুভূতি তাকে ছেয়ে ফেললো। মাত্র একটা কথার মধ্যে দিয়েই তার মনের এই গভীর দুঃখ প্রকাশ করবার চেষ্টা করলো। বার বার বলতে লাগলো, 'আমি হোমোগোরি যাব, আমি হোমোগোরি যাব।'

মা ক্লোরোসটিলেভের দিকে তাকিয়ে বললো, 'মিতিয়া, অনুগ্রহ করে এক গ্লাস জল দাও তো। এই যে শেরিওঝা, জলটা খেয়ে নাও। না, না, আর কাঁদতে পারবে না বলছি। কাঁদলে কিছুই লাভ হবে না। ডাক্তার বলেছে, তোমাকে আমরা সঙ্গে নিচ্ছি না এটা ঠিক। বোকার মত আর কাঁদে না···চুপ, চুপ, এবার চুপ কর। মনে নেই কতবার তো তোমাকে রেখে আমি পরীক্ষা দিতে বাইরে গেছি! আমাকে ছেড়ে তখন তো তুমি বেশ থাকতে। মনে নেই সে সব কথা?

এখন এমন করছো কেন বলতো? এখন তো কত বড়ও হয়েছ! তোমারই ভালর জন্য মাত্র কয়েকটা দিন আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে না?'

কি করে মা তার মনের কথা বুঝবে। তখন যে সব অন্যরকম ছিল। তখন সে কত ছোটটি আর কত বোকাই না ছিল! তখন মা না থাকলে সে মায়ের কথা ভুলেই যেত। তাছাড়া, মা তো তখন একাই যেত। আর এখন মা কোরোসটিলেভকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর আচমকা তার মনটা আর একটি ভাবনার ব্যথায় মুচড়ে উঠলো, ওরা কি লিয়োনিয়াকেও নিয়ে যাবে নাকি! একথাটা তো এতক্ষণ তার মনে হয়নি! কান্নাজড়ানো স্বরে এবার প্রশ্ন করলো, 'আর লিয়োনিয়া?'

মা একটু রেগে আর কেমন লাল হয়ে উত্তর দিল, 'ও তো একেবারে বাচ্চা, ওকে না নিয়ে গেলে চলে? একথা তুমি বোঝ না? আমাকে ছেড়ে ও থাকবে কেমন করে! তাছাড়া, ও তো তোমার মত অতবার অসুস্থ হয়ে পড়ে না, ওর টনসিল ফোলে না, জ্বরও হয় না।'

শেরিওঝা মাথা নিচু করে আবার কাঁদতে লাগলো। এবার নীরবে অসহায় ভঙ্গিতে কেঁদে চললো। লিয়োনিয়া থাকলেও না হয় সে সব সহ্য করতে পারতো। শুধু তাকেই ওরা এখানে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। তাহলে শুধু তাকেই ওরা চায় না।

রূপকথার গল্পে সে পড়েছে, 'অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিল।'

ওরা তাকে তো ঠিক তাই করে যাচ্ছে। তার প্রতি মায়ের অবিচারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার সঙ্গে এসে মিলল হীনতাবোধ। এই বিচিত্র অনুভূতি সারাজীবন তাকে ব্যথিত করবে। সে যে অনেক বিষয়ে লিয়োনিয়ার চেয়েও খারাপ, মা তো তা বলেই দিলে। তার গলা ফোলে, জ্বর হয়, তাই ওরা লিয়োনিয়াকে সঙ্গে নিচ্ছে আর তাকে এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছে।

কোরোসটিলেভ এবার, 'ওঃ!' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই আবার তক্ষুণি ফিরে এসে বললো, 'শেরিওঝা, এসো আমরা একটু বেরিয়ে আসি।'

মা চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই ঠাণ্ডার মধ্যে? আবার সে বিছানা নেবে দেখছি।'

কোরোসটিলেভ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'অসুখ তো লেগেই আছে, কি আর করা! এসো শেরিওঝা, চলে এসো।'

কাঁদতে কাঁদতেই সে কোরোসটিলেভকে অনুসরণ করলো। তার গলায় স্কার্ফটা জড়িয়ে, কোট পরিয়ে তারপর তার ছোট্ট হাতখান তার সবল হাতের মুঠোয় চেপে ধরে ওরা বাগানের দিকে চললো। যেতে যেতে কোরোসটিলেভ বললো, 'তুমি তো জান শেরিওঝা, ইচ্ছে না থাকলেও মানুষকে অনেক সময় অনেক কিছু করতে হয়। আমি কি হোমোগোরিতে যেতে চাই নাকি? তোমার মা-ই কি যেতে চায়? আমরা কেউই যেতে চাই না। ওখানে যাওয়া মানে আমাদের জীবনের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়া, কিন্তু ইচ্ছে না থাকলেও

আমাদের যেতে হচ্ছে। তাই আমরা যাচ্ছি। কতবার আমার জীবনে এরকম ঘটেছে।'

'কেন যেতে হচ্ছে ?'

'জীবনটা যে এমনিই সোনা।' কোরোসটিলেভ দুঃখভরা গম্ভীর স্বরে কথাটা বললো।

শেরিওঝা এবার যেন অনেকটা সান্ত্বনা পেল মনে। কোরোসটিলেভও তাহলে একটু দুঃখ পাচ্ছে। কোরোসটিলেভ আবার বলতে সুরু করলো, 'ওখানে আবার নূতন করে আমাদের ঘর সংসার গোছাতে হবে। তা ছাড়া, লিয়োনিয়া তো আছেই। ওকে একটা নার্সারিতে দিতে হবে। আর নার্সারি যদি অনেক দূরে হয় তাহলে তো ওর জন্য একটা নার্স রাখতেই হবে। সেটাও চাট্টিখানি কথা নয়। তাছাড়া, আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। জীবনে উন্নতি করতে হলে পরীক্ষা না দিয়ে উপায় নেই। দেখছো তো আমাদের জীবনে কত বাধ্যবাধকতা! তোমার তো মাত্র একটা কথা মানতে হবে—কিছু দিনের জন্য তোমাকে এখানে থাকতে হবে। আমাদের সঙ্গে গেলে তোমাকে এখন অনেক কষ্ট পেতে হবে, আবার তুমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

তাকে কেন ওরা এসব বলে ভোলাচ্ছে! সে তো ওদের সঙ্গে সব দুঃখ কষ্ট সমানভাবে ভোগ করতেই চায়। ওরা যা করবে সেও তাই করতে চায়। কোরোসটিলেভের দরদভরা কথাগুলোও তাকে এই ভাবনা থেকে রেহাই দিল না যে ওরা তাকে কেবল অসুস্থ বলেই এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছে না,

সে একটা বোঝা হবে বলেই ওকে ফেলে রেখে যাচ্ছে। কিন্তু সে তো সমস্ত মন দিয়ে এটা বুঝতে পারে যে কাউকে সত্যিকারের ভালবাসলে সে কখনও বোঝা হয়ে ওঠে না। তাহলে ওরা তাকে সত্যিই ভালবাসে কি না এই সন্দেহই এখন তাকে দোলা দিতে সুরু করেছে।

এবার ওরা বাগানে এলো। বাগানটা কেমন নিরালা, নিঝুম।

গাছের পাতাগুলো সব মাটিতে ঝরে পড়েছে, নেড়া গাছের ডালে পাখির বাসাগুলো কালো উলের বলের মত দেখাচ্ছে। ঝরা পাতার উপর দিয়ে শেরিওঝার জুতো মচ্‌মচ্‌ শব্দ করে চলেছে। কোরোসটিলেভের হাত ধরে সে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ দু'জনেই একেবারে নিশ্চুপ। হঠাৎ শেরিওঝা চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে উঠলো, 'ও একই কথা।'

'কি এক কথা?'

শেরিওঝা উত্তর দিল না। কোরোসটিলেভ একটু থেমে অপ্রস্তুত স্বরে বলে উঠলো, 'মাত্র আসছে গরমকাল পর্যন্ত, সোনা।'

শেরিওঝা কোন কথা বলতে পারল না। কিন্তু ওর মনটা বলে উঠতে চাইলো—আমি যা খুশি ভাবতে পারি, অঝোর ধারায় কেঁদে ভাসাতে পারি, কিন্তু কিছুতেই কিছু লাভ হবে না। তোমরা বড়, তোমাদের হাতে যখন ক্ষমতা রয়েছে তোমরা তোমাদের খুশিমত যা ইচ্ছে তাই করবে।

আমাকে এখানে ফেলে রেখে যাবে স্থির করলে তোমরা তা-ই করবে, আমার কোন কথাই শুনবে না।

তার মুখ দিয়ে স্বর ফুটলে সে একথাগুলোই বলতে পারতো। কিন্তু বড়দের অসীম ক্ষমতার কাছে সে যে কত অসহায়, নিরুপায় তা মনে মনে অনুভব করতে পারছে বলেই তার স্বর ফুটলো না।

সেদিন থেকে শেরিওঝা একেবারে নীরব, নির্বিকার হয়ে গেল। 'কেন?' এই প্রশ্নটি এখন আর সে করে না কাউকে। আজকাল সে একা একা মাসীর ঘরে গিয়ে সোফায় বসে পা দোলায় আর বিড় বিড় করে আপনমনে কি বলে। তাকে এখনও খুব বেশী বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। স্যাঁতসেঁতে বিরক্তিকর হেমন্তকালটার সঙ্গে সঙ্গে ওর অসুস্থতাও চলেছে।

কোরোসটিলেভ আজকাল প্রায় সারাদিন বাড়িতে থাকে না। তার কাজ অন্যকে বুঝিয়ে দেবার জন্য খুব সকালবেলাতেই সে ফার্মে চলে যায়। কিন্তু তার মধ্যেও সে শেরিওঝাকে ভোলে না। একদিন ঘুম থেকে জেগেই ও বিছানার পাশে টেবিলের উপর একটা বাড়ি বানাবার সরঞ্জাম দেখতে পেল, আর একদিন একটা বাদামী রঙের বাঁদরী।

শেরিওঝা বাঁদরীটাকে বড্ড ভালবাসে। এটা যেন তার ছোট্ট মেয়ে। সত্যি কিন্তু সে রাজকুমারীর মতই সুন্দর দেখতে। দু'হাতে ওটাকে জড়িয়ে ধরে সে বলে, 'তাহলে সোনা।' মনে মনে সে হোমোগোরিতে গেল এবং ওকেও সঙ্গে

নিয়ে গেল। ওকে চুমু দিয়ে আদর করে, ওর কানে কানে ফিসফিস করে কি বলে, রোজ রাত্রিবেলা ওকে তার বিছানার পাশটিতে শুইয়ে দেয়।

বিদায়-বেলা

তারপর একদিন কতকগুলো লোক এসে খাবার ঘর আর মায়ের ঘরের সব আসবাবপত্তর সরিয়ে গুছিয়ে বাঁধাছাঁদা করতে লেগে গেল। মা পর্দা আর ছবিগুলো সব নামিয়ে নিল। কিছুক্ষণ পর একটু আধটু দড়িদড়া, টুকটাক এটা ওটা ঘরের মেঝের ওপর এদিক ওদিকে ছড়িয়ে রইলো শুধু। শূন্য ঘরগুলো কী বিশ্রীই না লাগছে দেখতে! শুধু মাসীর ঘর আর রান্না ঘরটাই আগের মত সুন্দর আর গোছালো রইলো। সমস্ত বাড়িটাকেই যেন এই মূহূর্তে কেমন ছন্নছাড়া দেখাচ্ছে। চেয়ারগুলোকে একটার ওপর আর একটা ছাদের দিকে পা তুলে উল্টে রাখা হয়েছে। অন্য সময়ে এমনটি হলে কেমন মজা করে লুকোচুরি খেলা যেত। কিন্তু আজ আর সে প্রশ্ন নেই।

লোকগুলো কাজ সেরে অনেক রাত্রে চলে গেল। সবাই তারপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লো। লিয়োনিয়াও রোজকার মত কাঁদাকাঁটি করে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাসী আর লুকিয়ানিচ শুয়ে শুয়ে অনেক রাত অবধি ফিসফিস করে কি বললো আর সাথে সাথে নাক ঝাড়তে লাগলো। তারপর তারাও এক সময় নীরব হয়ে গেল। একটু পরেই

লুকিয়ানিচের নাক থেকে ঘর্ঘর শব্দ আর মাসীর নাক থেকে মৃদু শিসের মত শব্দ শোনা যেতে লাগলো।

কোরোসটিলেভ খাবার ঘরের টেবিলে বসে কি লিখে চলেছে একমনে। আচমকা তার পেছনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়ে পেছন ফিরে দেখে শেরিওঝা তার লম্বা রাত্রিবাস পরে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার গলায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কোরোসটিলেভ অবাক হয়ে মৃদু স্বরে প্রশ্ন করলো, 'এখানে কি করছো সোনা?'

শেরিওঝা করুণ স্বরে বলে উঠলো, 'তুমি আমায় নিয়ে চল। দয়া করে সঙ্গে নাও আমাকে। আমাকে ফেলে রেখে যেও না, ফেলে রেখে যেও না'..... এবার সে অঝোরে কাঁদতে লাগল। অন্যরা জেগে না যায় এজন্য অনেক কষ্টে কান্নার শব্দ চাপতে চেষ্টা করলো। কোরোসটিলেভ তাকে কাছে টেনে এনে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, 'দেখ দেখি সোনা, এই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর খালি পায়ে হাঁটা তোমার বারণ তুমি তো তা জান। তুমি আমাকে কথাও দিয়েছিলে এমনটি আর করবে না কোনদিন, তাই না?' শেরিওঝা তেমনি কাঁদতে কাঁদতে শুধু বললো, 'আমি হোমোগোরি যাব।'

কোরাসটিলেভ বললো, 'উঃ! পা দুটো কী ঠাণ্ডা তোমার!' লম্বা রাত্রিবাস দিয়ে তার ছোট্ট পা দু'টিকে ঢেকে বুকে ধরলো। এবার সে শীতে থরথর করে কাঁপছে। 'আর কোন উপায় না থাকলে কি করা যায় বল তো সোনা। তুমি সুস্থ নও।' 'আমি আর কোনদিন

অসুস্থ হব না......আমাকে শুধু নিয়ে চল।' 'তুমি একেবারে ভাল হয়ে গেলেই আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব সোনা।'

'সত্যি নেবে?'

'তোমার কাছে কোনদিন আমি মিথ্যে কথা বলেছি খোকন?' সত্যিই কোরোসটিলেভ এতদিন একটিও মিথ্যে কথা বলেনি তাকে। কিন্তু সব বড়দের মত সেও যদি কখনও কখনও মিথ্যে কথা বলে? হয়তো এবার তাকে মিথ্যে বলে ভোলাতে চেষ্টা করছে।

শেরিওঝা কোরোসটিলেভের সবল গলাখানিকে ছোট্ট দু'হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরে মুখ লুকিয়ে রইলো। ওর প্রশস্ত সুন্দর বুকখানিই যেন তার সবচেয়ে বড় আর নিরাপদ আশ্রয়। এই লোকটিই তার একমাত্র আশা, ভরসা। সমস্ত অন্তর ঢেলে এই একজনই তাকে ভালবাসে, আদর করে।

কোরোসটিলেভ তাকে কোলে নিয়ে ঘরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পায়চারি করতে করতে আদর মাখানো মৃদু স্বরে কত কথা বলে যাচ্ছে ওর কানে কানে।

'আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব। আমার খোকন আর আমি ট্রেনে করে যাব......ট্রেনটা হুস্ হুস্ করে ঝড়ের বেগে আমাদের নিয়ে উধাও হয়ে যাবে......কতলোক থাকবে সেই ট্রেনে......একটু পরেই দেখবো মা আমাদের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে স্টেশনে......ইঞ্জিনটা বাঁশি বাজিয়ে আবার ঝিকঝিক করে চলতে থাকবে। কেমন মজা, সোনা?'

শেরিওঝা কোরোসটিলেভের বুকে মুখ লুকিয়ে তখন ভেবে

চলেছে, আমাকে নিতে আসবার সময় ওর থাকবে না। মা-ও সময় পাবে না। কত লোক কোরোসটিলেভের কাছে আসবে, যাবে। টেলিফোন করে তাকে অনবরত বিরক্ত করবে।

কোরোসটিলেভের কাজের কি অন্ত থাকবে নাকি? তাছাড়া, তাকে পরীক্ষা দিতে হবে। রোজ রোজ লিয়োনিয়াকে ঘুম পাড়াতে হবে। অত কাজের মাঝে ওরা আমাকে একেবারেই ভুলে যাবে। আর আমি এখানে শুধু শুধু অপেক্ষা করবো কবে আমায় নিয়ে যাবে বলে......এই অপেক্ষার শেষ নেই বুঝি.......

কোরোসটিলেভ তখনও বলে চলেছে, 'জান, ওখানে সত্যিকারের বন আছে আর সেই বনে নাকি অজস্র বেরিফল ও বেঙের ছাতা আছে।

'সেই বনে নেকড়েরা থাকে?'

'তা তো ঠিক জানি না। নেকড়ে আছে কিনা জেনে নিয়ে তোমায় চিঠি লিখে জানাবো, কেমন? ওখানে একটা পাহাড়ী নদী আছে। আমরা দু'জনে স্নান করতে যাব, তোমাকে সাঁতার শিখিয়ে দেব।'

সত্যিই যদি তাই হয় তাহলে ভারী মজা হয় কিন্তু। তবুও মনটা যে ওর সন্দেহে, দ্বিধায় দুলছে।

'আমরা দু'জনে নদীতে মাছ ধরবো। বাঃ, দেখ, দেখ, বাইরে কেমন সুন্দর বরফ পড়ছে।'

এবার সে শেরিওঝাকে কোলে নিয়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো। পেঁজা তুলোর মত বরফ পড়ছে বাইরে।

মৃদু হাওয়ায় হালকা পালকের মত ভেসে ভেসে বেড়িয়ে জানালার কাছে এসে আস্তে ধাক্কা খাচ্ছে। শেরিওঝা সেদিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারপর তার বিষণ্ণ রুগ্ন মুখখানির বিবর্ণ নরম গালটি কোরোসটিলেভের গালে চেপে ধরলো। কোরোসটিলেভ তাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো, 'শীত তো এসেই গেল। এখন তুমি সারাটা দিন বাইরে খেলা করতে পারবে, স্লেজগাড়িতে চড়ে বরফের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করতে পারবে। আর দেখবে কত তাড়াতাড়ি তোমার সময় কেটে যাবে।'

'হাঁ.........কিন্তু।' শেরিওঝা ক্লান্ত স্বরে এবার বললো, 'আমার স্লেজের দড়িটা বড্ড পুরনো হয়ে গেছে। একটা নূতন দড়ি লাগিয়ে দেবে?'

'ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। কালই নূতন দড়ি লাগিয়ে দেব। কিন্তু তুমি আমায় একটা কথা দেবে বল? বল, আর কাঁদবে না? কাঁদলে তোমার খারাপ হয়, তোমার মাও অস্থির হয়ে যায় বোঝ তো? তাছাড়া, পুরুষ মানুষরা কি কাঁদে নাকি? তুমি কাঁদলে আমার ভাল লাগে না। বল, আর কাঁদবে না?'

'হুঁ'......শেরিওঝা আবার মুখ লুকিয়ে ক্ষীণস্বরে বললো।

'কথা দিলে তো?'

'হুঁ।'

'বেশ, মনে থাকে যেন। ভদ্রলোকের এক কথা। পুরুষের কথার কখনও নড়চড় হয় না, জান তো?'

কোরোসটিলেভ এবার তার ক্লান্ত ছোট্ট দেহখানি কোলে করে মাসীর ঘরে আস্তে নিয়ে এসে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বিছানাটা ভাল করে গুঁজে দিল। শেরিওঝা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কোরোসটিলেভ কিছুক্ষণ তার ঘুমন্ত সুন্দর মুখখানির দিকে তাকিয়ে রইলো। খাবার ঘরের আবছা আলোর ছটায় দেখা গেল তার মুখখানি কেমন বিবর্ণ, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। একটু পরে পা টিপে টিপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

যাত্রা হল সুরু

সেদিন ভোর হল। ভোর হতেই দিনটা কেমন মেঘাচ্ছন্ন মনে হোল, রোদ নেই, কুয়াসাও নেই। মাটির বুকে বরফ সব গলে গেছে, শুধু একটু পাতলা আস্তরণ ঝিকিমিকি করছে। আকাশটা ধূসরবর্ণ। পায়ের নীচে মাটি একটু ভিজে ভিজে। এমন দিনে স্লেজগাড়ি চালানো অসম্ভব, উঠানে যেতেই মন চায় না।

কোরোসটিলেভ ওর কথা মত সেজগাড়িতে নূতন দড়ি বেঁধে দিয়েছে। শেরিওঝা ঘুম থেকে জেগেই বারান্দার এক কোণে সেজগাড়িটা দেখতে পেল। কিন্তু কোরোসটিলেভ গেল কোথায়? মা লিয়োনিয়াকে সাজাচ্ছে। সাজানো যেন আর শেষ হতে চায় না। কিছুক্ষণ পর মা তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, 'দেখ, ওর নাকটা কি অদ্ভুত খাটো হয়েছে!'

শেরিওঝা ভাল করে তাকিয়ে দেখলো। অত্যন্ত সাধারণ একটা নাক। অদ্ভুত বা সুন্দর কিছু তো নয়! মা অমন করে বলছে, তার একমাত্র কারণ মা লিয়োনিয়াকে সত্যি ভালবাসে। মা আগে আমাকেও কত ভালবাসতো। এখন আমাকে আর ভালবাসে না, ওকেই ভালবাসে।

শেরিওঝা এবার আনমনে মাসীর কাছে রান্নাঘরে এলো। মাসীর হাজারটা কুসংস্কার আছে, খুঁতখুঁতানি আছে। কিন্তু তবুও মাসী তাকে ভালবাসে, তার কথা মন দিয়ে শোনে। মাসীর কাছে এসে সে প্রশ্ন করলো, 'কি করছো?'

'দেখতে পাচ্ছ না? মাংসের কাটলেট্ রাঁধছি।'

'এতগুলো কেন?'

বেসনে ডোবানো মাংসের টুকরো সারা টেবিলটায় ছড়িয়ে আছে।

'এবেলা আমরা সবাই খাব এবং ওরাও রাস্তার খাবার সঙ্গে করে নেবে।'

'ওরা কি এখনই চলে যাচ্ছে?'

'ঠিক এক্ষুণি নয়। সন্ধ্যেবেলায় যাবে।'

'আর কত ঘণ্টা বাকি আছে?'

'অনেক দেরী এখনও। সন্ধ্যের পর রওনা হবে। দিনের বেলা যাবে না।'

মাসী আর কোন কথা না বলে কাটলেট ভাজতে লাগলো। শেরিওঝা টেবিলটার কোণে মাথা হেলিয়ে ভাবতে লাগলো কত কি......লুকিয়ানিচ আমাকে ভালবাসে......এখন থেকে

আরও অনেক বেশী বেশী করে ভালবাসবে। ওর সঙ্গে নৌকো করে বেড়াতে যাব আমি…… তারপর ডুবে যাব নদীতে…… তারপর ওরা আমাকে বড়দিদিমার মত মাটিতে শুইয়ে কবর দিয়ে দেবে। কোরোসটিলেভ আর মা যখন শুনবে সেকথা ওরা দুঃখ পাবে আর বলবে কেন আমরা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম না……ছেলেটা ওর বয়সের তুলনায় কত বেশী চালাক ছিল……কত ভাল ছিল। লিয়োনিয়ার চাইতেও হাজার গুণে ভাল ছিল। কখনও কাঁদতো না, বিরক্ত করতো না আমাদের। না, না, বড়দিদিমার মত আমাকে কবর দিতে দিব না। আমি তাহলে যে ভয় পাবো, একা একা কেমন করে ওখানে শুয়ে থাকবো। এখানেই বেশ থাকতে পারবো আমি। লুকিয়ানিচ আমাকে কত আপেল, চকোলেট এনে দেবে, এমনি করে একদিন আমি কত বড় হবো……ক্যাপ্টেন হবো……তখন মা আর কোরোসটিলেভ একেবারে গরীব হয়ে যাবে। কোরোসটিলেভ একদিন আমার কাছে এসে বলবে, 'তোমার কাঠ কাটতে দাও আমাকে।' আমি তখন মাসীকে বলবো, 'ওকে কালকের বাসি খাবারগুলো খেতে দাও তো।'

এসব উদ্ভট ভাবনা ভাবতে ভাবতে আচমকা শেরিওঝার মা আর কোরোসটিলেভের জন্য এমন কষ্ট হোল যে সে তক্ষুণি কেঁদে ফেললো। মাসী তার দিকে তাকিয়ে শুধু বললো একবার, 'হায় ভগবান!' শেরিওঝার সেই মুহূর্তে মনে পড়লো সে কোরোসটিলেভকে যে কথা দিয়েছে আর কাঁদবে না। সে তাড়াতাড়ি বল্লে উঠলো, 'আর কাঁদবো না আমি।'

এমন সময় দিদিমা সেই কালো ব্যাগ হাতে রান্নাঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলো, 'মিতিয়া বাড়ি নেই ?'

মাসী বললো, 'গাড়ির ব্যবস্থা করতে বাইরে গেছে। আভারকিভ কি ছোটলোক, কোরোসটিলেভকে গাড়ি দেবে না।'

দিদিমা বলল, 'ছোটলোক কেন ? লরী দিয়েছে তো! গাড়ি তো ওর খামারের জন্য প্রয়োজন। আর মালপত্র নিয়ে তো লরীতে যাওয়াই সুবিধে।'

পাশা মাসী বললো, 'মালপত্রের জন্য ভাল, কিন্তু একটা গাড়ি পেলে মরিয়ানা আর বাচ্চাটার খুব সুবিধে হোত।'

দিদিমা বিরক্তিভরা স্বরে বললো, 'আজকালকার লোক-গুলোই হয়েছে অদ্ভুত। আমাদের দিনে আমরা গাড়ি বা লরীতে বাচ্চাদের নিতামই না। আমরাও তো ছেলেপুলে মানুষ করেছি বাপু। মরিয়ানা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসে বেশ যেতে পারে।'

শেরিওঝা চোখ মুছতে মুছতে ওদের বকবকানি শুনছে। আসন্ন ও নিশ্চিত বিদায়ের ভাবনায় মনটা তার কেমন বিষণ্ণ হয়ে আছে। গাড়ি বা লরী যাতেই হোক না কেন, ওরা আর কিছুক্ষণ বাদেই তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু সে ওদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তবুও ওরা তাকে ফেলে রেখে চলে যাবে।

দিদিমা আবার বলছে, 'মিতিয়া এতক্ষণ কি করছে ? আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এলাম যে!'

মাসী বললো, 'কেন, আপনি ওদের যাবার সময় আসবেন না?'

'না। আমাকে আবার কনফারেন্সে যেতে হবে কিনা?' দিদিমা এবার মায়ের কাছে চলে গেল।

তারপর আবার সব চুপচাপ। দিনটা আরও মেঘলা হোল। ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগলো। সার্সিগুলো বাতাসের ধাক্কায় ঝটপট নড়ছে। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার বরফ পড়া স্থরু হোল। শেরিওঝা মাসীর কাছে প্রশ্ন করলো, 'আর ক' ঘণ্টা বাকি আছে?'

'এখনও অনেক দেরী আছে।'

খাবার ঘরের একদিকে আসবাবপত্তরগুলো বাঁধাছাঁদা করে রাখা হয়েছে, মা আর দিদিমা সেখানে বসেই কথা বলছে। দিদিমা বলছে, 'ওঃ, মিতিয়া এতক্ষণ কি করছে বল তো? আমার সঙ্গে ওর আর দেখা হবে কিনা কে জানে!' শেরিওঝা দিদিমার কথা শুনে ভাবলো, দিদিমাও বুঝি ভয় পাচ্ছে যদি মিতিয়া আর ফিরে না আসে, একেবারে চলে যায়!

শেরিওঝা লক্ষ্য করলো দিনের আলো প্রায় নিবু নিবু হয়ে আসছে। আর একটু পরেই হয়তো আলো জ্বালাতে হবে। কত তাড়াতাড়ি সময় বয়ে যাচ্ছে আজ! পাশের ঘরে লিয়োনিয়া কেঁদে উঠলো, মা পড়ি কি মরি করে শেরিওঝাকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় তার দিকে এক পলক তাকিয়ে স্নেহভরে বলে গেল,

'খেলা করছো না কেন শেরিওঝা ?' হাঁ, খেলা করতে পারলে তো ও নিজেও খুশী হোত। সেই বাঁদরীটাকে নিয়ে খেলা করতে সে কত চেষ্টা করলো। তারপর সেই খেলনা দালানটাও তৈরি করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারছে না যে! কিছুই তার ভাল লাগছে না আজ।

রান্নাঘরের দরজা খোলার শব্দের সঙ্গে ভারী পায়ের শব্দ এবং কোরোসটিলেভের উঁচু স্বর শোনা গেল। 'এক ঘণ্টার মধ্যে লরী এলো বলে। আমরা এবার খেয়ে নিই চল।' দিদিমা তাকে দেখে প্রশ্ন করলো এবার, 'তাহলে গাড়ি পেলে না ?'

'না, ওদের কাজ আছে বললো। থাকগে, আমরা লরীতেই বেশ যেতে পারবো।'

কোরোসটিলেভের গলা শুনে অন্যদিনের মতই শেরিওঝার মনটা আনন্দে খুশীতে ভরে উঠলো, ইচ্ছে হোল এক্ষুণি গিয়ে ছুটে ওর কোলে ওঠে। কিন্তু তখনই আবার মনটা বলে উঠলো, না, আর একটু বাদেই তো ওরা চলে যাবে······তবে আর কেন······আনমনে সে আবার খেলনাগুলোই নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

কোরোসটিলেভ এবার তার দিকে তাকিয়ে অপ্রতিভভাবে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বললো, 'কি খবর শেরিওঝা ?'

তারপর ওরা খেতে বসলো। খুব তাড়াহুড়ো করেই খেয়ে উঠলো। দিদিমা চলে গেল। এখন বেশ আঁধার হয়ে আসছে চারদিক। কোরোসটিলেভ টেলিফোনে কাকে বিদায়

সম্ভাষণ জানাচ্ছে। শেরিওঝা ওর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফোনে কথা বলতে বলতে কোরোসটিলেভ ওর লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলো তার নরম চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিচ্ছে।

এমনি সময় তিমোখিন ঘরে ঢুকে বললো, 'এই যে, সব তৈরী তো? আমাকে একটা কুড়ুল দাও তো। বরফ না কাটলে তো ফটকটা খোলাই যাবে না।'

লুকিয়ানিচও তার সঙ্গে বরফ কাটতে গেল। মা লিয়োনিয়াকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁথায় জড়িয়ে নিতে লাগলো।

কোরোসটিলেভ বললো, 'এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? এখনও অনেক সময় আছে।'

তারপর কোরোসটিলেভ, লুকিয়ানিচ আর তিমোখিন তিনজনে মিলে বাঁধাছাঁদা জিনিসপত্তর সব তুলতে আরম্ভ করলো।

ওদের প্রত্যেকের জুতোয় বরফ ঢুকে গেছে। কিন্তু কেউ আজ বরফ ঝেড়ে ফেলে ঘরে আসছে না। মাসীও আজ এজন্য ওদের বকছে না। সমস্ত মেঝে জলে জলে একাকার হয়ে গেল। ঘরের এদিকে ওদিকে যত রাজ্যের নোংরা টুকি টাকি ছড়িয়ে আছে। মাসী উপদেশ দিতে দিতে এঘর থেকে ওঘরে ছুটোছুটি করছে।

মা লিয়োনিয়াকে কোলে নিয়ে শেরিওঝার কাছে এসে এক হাত দিয়ে তাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে তার মাথাটা

কোলের কাছে নিতে চেষ্টা করতেই সে দূরে সরে গেল। মা তাকে ফেলে রেখেই চলে যেতে পারছে, তবে কেন আর এভাবে জড়িয়ে ধরতে আসা ?

একে একে সব জিনিসপত্তর লরীতে ওঠানো হোল। উঃ! ঘরগুলোকে কী শূন্য দেখাচ্ছে! এদিক ওদিক মেঝের ওপর দু' এক টুকরো কাগজ বা খালি ওষুধের শিশি পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে শুধু। সব জিনিসপত্তর বোঝাই হয়ে ঘরগুলো কী সুন্দরই না ছিল দেখতে! আর এখন মনে হচ্ছে সমস্ত বাড়িটাই কী পুরনো আর বিশ্রী! লুকিয়ানিচ মাসীর হাতে একটা কোট দিয়ে বলছে, 'নাও, এটা পরে নাও। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা।'

শেরিওঝা আচমকা যেন কি এক আতঙ্কে চমকে উঠে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বললো, 'আমিও বাইরে যাব ?'

মাসী নরম সুরে বললো, 'হাঁ, যাবে বৈকি, এসো, তোমায় কোটটা পরিয়ে দিই।'

মা আর কোরোসটিলেভও ওদের কোট পরে নিচ্ছে। কোরোসটিলেভ শেরিওঝাকে কোলে তুলে নিয়ে গভীর স্নেহে চুমু খেতে লাগলো। একটু পরে বললো, 'কিছুদিনের জন্য বিদায় সোনা। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে নাও। আমাদের যা কথা হয়েছে মনে রেখো, কেমন ?'

মাও এবার তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল তারপর হঠাৎ কাঁদতে সুরু করলো। কান্না জড়ানো স্বরে মা আবার বলছে, 'আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালে না শেরিওঝা ?' শেরিওঝা

খুব তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'বিদায়!' কিন্তু সে তখন কোরোসটিলেভের দিকেই তাকিয়ে আছে। কোরোসটিলেভ আবার বললো, 'লক্ষ্মীছেলে।'

মা তখনও কাঁদছে। চোখ মুছতে মুছতে মাসী আর লুকিয়ানিচকে মা বলছে, 'তোমরা যা করেছ তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

মাসী বললো, 'ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই।'

'শেরিওঝাকে দেখো।'

'সেজন্য তুমি কিছু ভেবো না।' মাসীও এবার কেঁদে ফেললো। কেঁদে কেঁদেই বললো, 'এক মিনিট আমাদের সবাইকে একত্রে বসতে হবে যে। এসো ...'

লুকিয়ানিচ চারদিকে তাকিয়ে বললো, 'কোথায় বসবে?'

মাসী বললো, 'হা ভগবান! আচ্ছা এসো, আমাদের ঘরেই এসো না হয়।'

তারা সবাই এবার মাসীর ঘরে গিয়ে নীরবে কয়েক মুহূর্তের জন্য মাথা নীচু করে বসলো। তারপর মাসীই প্রথম উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।'

এবার ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে এলো। বাইরে তখন বরফ পড়ছে আর চারদিক কেমন সাদা সাদা দেখাচ্ছে। ফটকটা খুলে দেওয়া হয়েছে। বাইরেও একটা ঝাড় লণ্ঠন জ্বেলে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাল বোঝাই লরীটা বাইরে ভূতের মতন দাঁড়িয়ে আছে। তিমোখিন ক্যানভাসের পর্দা দিয়ে সব জিনিসপত্তরগুলো ভাল

করে ঢেকে দিচ্ছে। গুরিকও ওর বাবাকে সাহায্য করছে। ভাস্কার মা, লিডা, পাড়াপড়শী আরও অনেকে বাইরে বাড়ির সামনে এসে জড়ো হয়েছে ওদের বিদায় দেবার জন্য।

শেরিওঝার মনে হচ্ছে ওদের যেন জীবনে এই প্রথম সে দেখছে। সমস্ত কিছুই তার কাছে বড় অদ্ভুত, অজানা মনে হচ্ছে। ওদের কথাগুলোও যেন একেবারে অন্যরকম।

উঠানটাকেও ওদের উঠান বলে মনে হচ্ছে না তো! এখানে যেন সে কোনদিনই থাকেনি, ঐ ছেলেদের সঙ্গে খেলাও করেনি কোনদিন····· এই লরীটাতে চড়েওনি কোন-কালে......এসবের কিছুই যেন তার কোন দিন ছিল না, আর হবেও না কারণ সে আজ পরিত্যক্ত।

তিমোখিন বলছে, 'আজ গাড়ি চালানোও মুশকিল। পথঘাট এত পিছল হয়ে গেছে!'

কোরোসটিলেভ এবার মা আর লিয়োনিয়াকে সামনের সিটে বসিয়ে একটা শাল দিয়ে ওদের ঢেকে দিল। কোরোসটিলেভ ওদের সবার চাইতে বেশী ভালবাসে। তাই এত যত্ন নিচ্ছে। ওদের যাতে ঠাণ্ডা না লাগে, ওরা যাতে আরাম করে যেতে পারে সেজন্যই ও এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারপর নিজে লরীর পেছনে উঠে দাঁড়ালো। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দেখাচ্ছে ওকে।

মাসী ওকে ডেকে বললো, 'ক্যানভাসের ভিতরে যাও মিতিয়া, না হয় মুখে বরফ পড়বে যে!' কোরোসটিলেভ কোন কথা বললো না, নড়লোও না।

শেরিওঝার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললো এবার, 'একটু পেছনে সরে যাও সোনা। না হলে চাপা পড়বে যে।'

লরীটা এবার গর্জন করতে সুরু করলো। তিমোখিন উঠে বসেছে। লরীটা তাই হাঁকডাক করতে করতে নড়বার চেষ্টা করছে। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওটা একটু পেছনে সরলো, তারপর আবার সামনে, আবার একটুখানি পেছনে সরলো। এখন ওটা রওনা হবে, হুস করে চলে যাবে। তারপর ফটকটা বন্ধ করে দেওয়া হবে, আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে… …আর সব শেষ হয়ে যাবে।

শেরিওঝা একপাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। বরফ পড়ছে তার সর্বাঙ্গে। প্রাণপণ শক্তিতে সে কেবল তার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করছে আর কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। কেউ দেখতে না পায় এমনিভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে শুধু। নীরব অসহায় সেই কান্নার এক ফোঁটা জল চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো আর আলোতে চিকচিক করতে লাগলো। ছোট্ট ছেলের অবুঝ কান্না নয় কিন্তু, বয়স্ক ছেলের মান-অভিমান অপমান মেশানো তিক্ত অশ্রু।

না, আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সে এবার পেছন ফিরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, ছোট্ট শরীরটাকে অনেক কষ্টে টেনে নিয়ে চললো বাড়ির মধ্যে। কোরোসটিলেভ হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'এই গাড়ি থামাও, থামাও। শেরিওঝা, এসো, তাড়াতাড়ি চলে এসো। তোমার জিনিসপত্তর নিয়ে চলে এসো। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ।' এবার সে লরী

থেকে লাফিয়ে নীচে নামলো। তারপর আবার চেঁচিয়ে বললো, 'তাড়াতাড়ি চলে এসো। তোমার ওখানে কি আছে? শুধু কয়েকটা খেলনা নিয়ে এসো। একমিনিটও দেরী করো না, এসো।'

দরজার ওদিক থেকে মাসী আর লরীর ভেতর থেকে মা প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলো, 'মিতিয়া তুমি ভাবছ কি? কি করছো ভেবে দেখেছ কি? পাগল হলে নাকি?'

কোরোসটিলেভ এবার রেগে বলে উঠলো, 'আঃ! তোমরা চুপ কর তো। তোমরা কি কিছুই বোঝ না? কি করতে যাচ্ছিলাম আমরা বলতে পার? এ তো শরীরের একটা অংশ কেটে বাদ দেবার মত হচ্ছে। তোমরা যাই বল না কেন, আমি তা সহ্য করতে পারব না, বুঝলে?'

মাসী কেঁদে ফেলে বলে উঠলো, 'কিন্তু ও যে ওখানে গেলে মরে যাবে।'

কোরোসটিলেভ আবার বললো, 'বাজে কথা বোলো না তো! আমি ওর দায়িত্ব নিচ্ছি, বুঝলে? ও ওখানে গেলে মরে যবে না। ওসব তোমাদের প্রলাপ। এসো সোনা।' কোরোসটিলেভ এবার দৌড়ে বাড়ির ভেতর ঢুকলো।

শেরিওঝা প্রথম কোরোসটিলেভের কথা শুনে নড়তে পারছিল না। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। বিশ্বাস করতে ভয় করছিল। তার বুক কাঁপতে লাগলো, কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর সে একছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে বাঁদরীটাকে এক হাতে জাপটে ধরে

আবার ভাবলো কোরোসটিলেভ যদি আবার ওর মত বদলায়! মা আর মাসী হয়তো তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওর মত ঘুরিয়ে দেবে।

কোরোসটিলেভও তখন তারই দিকে ছুটে আসছে আর বলছে, 'কি করছো? তাড়াতাড়ি এসো, চলে এসো।'

এবার ও শেরিওঝার সঙ্গে ঘরে ঢুকে তার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিতে লাগলো। মাসী আর লুকিয়ানিচও এবার ওদের কাছে এসে সাহায্য করতে লাগলো।

লুকিয়ানিচ শেরিওঝার বিছানা বেঁধে দিতে দিতে বললো, 'তুমি ঠিকই করলে মিতিয়া। এ বেশ ভালই হোল।'

শেরিওঝা মাসীর দেওয়া একটা বাক্সে যে কয়টি খেলনা হাতের কাছে পেল ঢুকিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। দেরী করা চলবে না তো...ওরা যদি আবার চলে যায়? তার ছোট্ট বুকটা ধুক ধুক করে কাঁপছে কেবল। সে উত্তেজনায় কিছু শুনতেও পাচ্ছে না, নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে যেন। মাসী তাকে সাজিয়ে দিতে এলে সে কেবল বললো, 'তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর।' তারপর আকুল দৃষ্টিতে কোরোসটিলেভকে খুঁজতে লাগলো। দরজার কাছে এসে দেখলো লরীটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কোরোসটিলেভ লরীতে ওঠেনি, দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। শেরিওঝাকে বলল সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে।

তারপর কোরোসটিলেভের পাশে এসে দাঁড়াতেই ও তাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর

মা আর লিয়োনিয়ার পাশটিতে তাকে বসিয়ে মায়ের শালের নীচে ঢুকিয়ে দিল। এবার লরীটা চলতে সুরু করলো। ওঃ! এবার তাহলে আর দুর্ভাবনা নেই···এবার সে নিশ্চিন্ত।

লরীর সামনের সিটে তিমোখিন, মা, লিয়োনিয়া আর সে। একজন দু'জন নয়, একেবারে চার চারজন! তিমোখিন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় শেরিওঝার কাশি এলো। মা আর তিমোখিনের মাঝখানটিতে সে আঁটসাঁট হয়ে বসেছে। তার টুপিটা একটা চোখের উপর হেলে পড়েছে। স্কার্ফটা মাসী কী শক্ত করেই না বেঁধে দিয়েছে! লরীর আলোতে সে শুধু দেখতে পেল বরফ নাচছে কেবল। গাদাগাদি করে কষ্টেসৃষ্টে বসেছে ওরা। তাতে কি যায় আসে? তবুও তো ওরা সবাই একসঙ্গে যাচ্ছে। আমাদের তিমোখিন আমাদের হোমোগোরিতে নিয়ে যাচ্ছে। আর লরীর পেছনে কোরোসটিলেভ আছে। সে আমাকে কত ভালবাসে আমার সব দায়িত্ব এখন ওর। বাইরে বরফের মধ্যে এত ঠাণ্ডায় সে বসেছে আর আমরা গাড়ির ভেতরে কত আরামে বসে আছি! তাহলেও ও আমাদের নিরাপদে হোমোগোরি নিয়ে যাবে। আমরা হোমোগোরি যাচ্ছি, কি চমৎকার! জানিনা সেখানে কি আছে, কিন্তু আমরা সেখানে গেলে ভারী মজা হবে। তিমোখিনের লরীটা হঠাৎ ভোঁ ভোঁ করে গর্জে উঠলো। বরফ শেরিওঝার হাসিভরা চোখে মুখে পড়তে লাগলো।